মহাকাশের ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত

নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

মহাশূন্যের প্রথম বাঙালী অভিযাত্রীকে

ভূমিকা॥ এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমার মৌলিক কৃতিত্ব কিছু নেই। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কয়েকটি ইংরেজি বই থেকে এই বইয়ের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত। বিশেষ ভাবে সাহায্য নিয়েছি চারটি ইংরেজি বই থেকে (The Stars in their Courses by James Jeans, Life on other World by H. Spencer Jones, Into Space by P. E. Cleator, The Exploration of Space by Arthur C. Clarke), বিদেশী ভাষায় যাঁরা এ ধরনের বই রচনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ক্ষেত্রে এক-একজন দিকপাল ; বাংলা ভাষায় বই রচনা করতে গিয়ে আমি তাঁদের লেখার ভঙ্গিকে ও বিষয়বিন্যাসকে অনুকরণ করেছি। এই বইয়ের সবকটি ছবি এবং অধিকাংশ দৃষ্টান্ত বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে নেওয়া। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে যে কবিতার উদ্ধৃতি আছে তা সবই রবীন্দ্রনাথের। আমি নিজে যেটুকু স্বাধীনতা নিয়েছি তা হচ্ছে এই যে, মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে যে-সব বিভিন্ন তত্ত্ব আছে—তার বাচবিচারের মধ্যে আমি যাইনি। কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব এই বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে, তার মানে এই নয় যে একমাত্র সেই তত্ত্বটিই গ্রাহ্য। আমার উদ্দেশ্য, মহাবিশ্বের গঠন ও মহাশূন্যে অভিযান সম্পর্কে পাঠকের মনে সুস্পষ্ট একটি ধারণা গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যসাধনে যদি সফল হয়ে থাকি তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক।—লেখক।
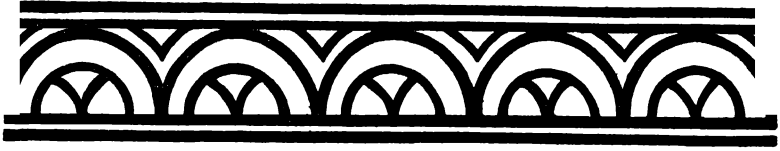
সাড়ে চারশো বছর আগে

সূর্য বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং সূর্য স্থিতিশীল—এই বক্তব্য উদ্ভট, দার্শনিক বিচারে মিথ্যা ; এবং যেহেতু এই বক্তব্য ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধী অতএব স্পষ্টতই ঈশ্বরবিরোধিতা।

পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয় এবং স্থিতিশীল নয়, এবং বার্ষিক গতি ছাড়াও পৃথিবীর আহ্নিক গতিও আছে—এই বক্তব্যও সমান উদ্ভট ও মিথ্যা…

গ্যালিলিওর বিচারে কার্ডিনালের রায়

মাত্র সাড়ে চারশো বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। নীল আকাশ দিয়ে মোড়া এই পৃথিবী স্থির ও অবিচল। বিশ্বজগতের সম্রাজ্ঞীর মতো। আর এই সম্রাজ্ঞীকে প্রণতি জানিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র। অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না। মানুষের প্রত্যক্ষ-গোচর বিশ্বই ছিল এই ধারণার সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হত একটি উল্‌টনো গামলা দিগন্ত-বৃত্তে এসে মিশেছে। একটি নিটোল গোলক যেন। আর এই গোলকের বিভিন্ন পরিধি-রেখায় চলেছে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের অবিরাম পরিক্রমা। দিনের বেলা সূর্য থাকে পৃথিবীর 'উপরে', রাত্রিবেলা পৃথিবীর 'নিচে'। নক্ষত্রের অবস্থান দিনের বেলা পৃথিবীর 'নিচে', রাত্রিবেলা পৃথিবীর 'উপরে'। আর এই সূর্য-নক্ষত্র বসানো বিশ্ব-গোলকটি প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার চক্রাবর্তন করে। এই ছিল সেকালের সহজ সরল বিশ্বতত্ত্ব। মানুষকে বলা হল, এইটুকু জেনেই খুশি থাকো, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না, এর বাইরে যা কিছু ঘটে তা ঐশ্বরিক।

কিন্তু দেখা গেল, শুধু এইটুকু জেনেই খুশি থাকা যায় না। বিশ্বতত্ত্ব এতটা সরল নয়। একটি মাত্র গোলকের চক্রাবর্তনই যদি হবে—তবে কেন কতকগুলি বিশেষ নক্ষত্র অন্য কতকগুলি বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থানগত বিচারে অনবরত স্থান পরিবর্তন করে? এমনি আরো অজস্র প্রশ্ন মানুষের মনে ভিড় করে আসতে লাগল।

সঞ্চরণশীল নক্ষত্রগুলির নাম দেওয়া হল 'গ্রহ'। বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই ভ্রাম্যমান নক্ষত্রগুলির কি নিজস্ব কোন গতি আছে? তাঁরা লক্ষ্য করলেন, একই গ্রহ শুক্র কখনো বা সূর্যাস্তের আকাশে প্রদীপের মতো উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা, কখনো বা সূর্যোদয়ের আকাশে টিপের মতো ম্লান শুকতারা। বৃহস্পতি গ্রহের পরিক্রমা পাণ্ডবদের বনবাসের মতো দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অলস ও মন্থর। আবার মঙ্গলগ্রহ এই পরিক্রমা শেষ করে দু-বছরে। শনিগ্রহ ত্রিশ বছরে। আর বুধগ্রহের পরিক্রমা-গতির তো কোন হদিশই পাওয়া যায় না। নিঃসম্পর্ক ও নিঃসঙ্গ তার যাত্রাপথ। কেন এমনটি হবে? কেন? কেন?

পাদ্রিরা শিউরে উঠে বললেন, খবরদার, এটা হচ্ছে ঈশ্বরের অলৌকিক রাজ্যের ব্যাপার। 'কেন' প্রশ্ন তুলতে যেও না। শুধু বিশ্বাস করো।

কিন্তু মানুষের মনের প্রশ্নকে শুধু বিশ্বাস দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আকাশের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, কেন এমনটি হয়?

তাছাড়া আকাশে সূর্য, নক্ষত্র ও গ্রহ ছাড়াও আরেকটি অতি বাস্তব জ্যোতিষ্ক আছে, সেটি হচ্ছে চন্দ্র। সূর্যকে যদি বলা হয় দিনের দৃষ্টিপ্রদীপ, তবে চন্দ্র হচ্ছে রাত্রির। দেখা গেল, চন্দ্রেরও স্বতন্ত্র একটা পরিক্রমা আছে। প্রায় আঠাশ দিনে তার একটি আবর্তন।

কিন্তু ধর্মের বইয়ে লেখা আছে, মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার অধিষ্ঠান বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর মানুষের বাসভূমি

এই পৃথিবীর উদ্দেশেই মুক্তোখচিত রাত্রির আকাশের আরতি, সূর্যঝলা দিনের আকাশের উদ্ভাস। অমৃতের সন্তান হে মানুষ, শুধু বিশ্বাস রেখো যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি তোমার উপরেই বর্ষিত হচ্ছে।

বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। পৃথিবীর বিশেষ অবস্থান নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন তোলা হল না। ধরে নেওয়া হল যে পৃথিবীর হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে চলেছে সাতটি জ্যোতিষ্কের চক্রাবর্তন। সূর্য, চন্দ্র এবং পাঁচটি গ্রহ। আর প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের নিজস্ব এক-একটি পরিক্রমা-বৃত্ত আছে। আর এই সাতটি পরিক্রমা-বৃত্ত এবং সাতটি জ্যোতিষ্ককে ছাড়িয়ে নক্ষত্রখচিত অসীম মহাশূন্য স্থির ও অবিচল। যেন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত সন্তান মানুষ ও তার বাসভূমি পৃথিবীর উপরে রাজছত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এই তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন টলেমি। পনেরো-শো বছর ধরে মানুষ নির্বিচারে এই তত্ত্বেই বিশ্বাস রেখেছিল!

কিন্তু শুধু বিশ্বাসের জোরেই কোন তত্ত্ব চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। মানুষের সজীব দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে বহির্বিশ্বের আলো-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শ মানুষের মস্তিষ্কে সাড়া জাগায়। আর মানুষ যে মানুষ হতে পেরেছে তার কারণ মানুষের এই অনুভূতি-বোধের সবটুকুই বেঁচে থাকার তাড়নায় খরচ হয়ে যায় না—কিছুটা উদ্‌বৃত্ত থাকে। আর এই উদ্‌বৃত্ত অনুভূতির জমিতেই জন্ম নেয় মানুষের জিজ্ঞাসা—কেন? যে-মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা যতো প্রবল, মানুষ হিসেবে সে ততো বড়ো।

পনেরো-শো বছর ধরে এই 'কেন'র প্রশ্নবাণ বহুবার টলেমির বিশ্বতত্ত্বকে বিদ্ধ করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বহু আগেই এই তত্ত্বের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রলেপ বহুবার এই তত্ত্বকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে। আর

প্রতিবারেই এই তত্ত্ব নিজস্ব কাঠামোকে বজায় রেখে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরেকটু। ফলে বিরোধী পক্ষের আঘাতে এই তত্ত্বের বহিরঙ্গেরই পরিবর্তন হয়েছে মাত্র—মূল কাঠামোর দিক থেকে অক্ষত থেকে গেছে।

ক্রমে ক্রমে নির্ভুলভাবে জানা গেল যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরিক্রমা এত বেশি বিচিত্র ও জটিল যে মাত্র সাতটি পরিক্রমা-বৃত্তের সীমানার মধ্যে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়? কেন এক-একটি গ্রহ হঠাৎ নিজের বৃত্ত ছেড়ে দিয়ে নেহাতই খামখেয়ালির মতো অন্য একটি বৃত্তে অনধিকার প্রবেশ করে? আবর্তনশীল বৃত্তের সংখ্যা মাত্র সাতটি ধরে নিলে অনেক কিছুরই কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাদরিরা বললেন, সব ব্যাপারের কারণ খুঁজতে যেও না। বিশ্ব-চরাচর জুড়ে অনন্ত আত্মা অধিষ্ঠিত আছে। তাঁরই ইচ্ছায় সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে। জ্যোতিষ্কলোকে যা কিছু বিচিত্র ঘটনা দেখছ, সব তাঁরই ইচ্ছায়। অনন্ত আত্মার কারণ খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। শুধু বিশ্বাস রেখো।

কিন্তু আগেই বলেছি, মানুষের যেমন খিদে পায় আর খিদের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না, তেমনি বিশ্ব-চরাচরের দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন? আর এই 'কেন'-র জবাব না পেলে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। এই অস্থিরতার তাড়নাকে কোন পাদ্রি চোখ রাঙিয়ে স্তব্ধ করতে পারেনি।

জ্যোতিষ্কলোকের বিচিত্র গতিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত আবর্তনশীল বৃত্তপথের সংখ্যা বাড়াতে হল। সাত থেকে আট, আট থেকে নয়—এমনিভাবে বাড়তে বাড়তে সংখ্যাটা এসে দাঁড়াল উনত্রিশ-এ। আর উনত্রিশটি বৃত্তপথের চক্রাবর্তনে এমন একটা জটিলতা সৃষ্টি হল যা সাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে মস্ত মস্ত পণ্ডিতরা এই উনত্রিশটি বৃত্তপথের রহস্যকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টায়

গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন। কিন্তু তবুও অনেকেরই মনে হতে লাগল, সারা আকাশে ঊনত্রিশটি বৃত্তপথের ফাঁস ঝুলিয়েও জ্যোতিষ্কলোকের 'খামখেয়ালিপনাকে' বন্ধ করা যাচ্ছে না। আবার প্রশ্ন জাগে—কেন? অন্ধ বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে কিছুতেই আর এই জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে চাপা দেওয়া গেল না।

অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুষ যে চিরকাল বিদ্রোহ করে এসেছে, তার প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছে। সাড়ে চারশো বছর আগে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কোপারনিকাস এমনি বিদ্রোহ করেছিলেন। অবশ্য কোপারনিকাসকে কোন ক্রমেই পথিকৃৎ বলা চলে না। কোপারনিকাসের সময় থেকে দু-হাজার বছর আগে পিথাগোরাস নামে একজন গণিতজ্ঞ স্পষ্টই বলেছিলেন যে এই পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, এই পৃথিবীও সূর্যের চারপাশে আবর্তনশীল নক্ষত্র মাত্র। পিথাগোরাসের উক্তিকে সেদিন পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।' স্বয়ং আরিস্টটল পর্যন্ত পিথাগোরাস-বিরোধীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিথাগোরাসের সেই উক্তি দু-হাজার বছর ধরে বেঁচেছিল। সে-যুগে আরো বেশি জানতে চাওয়াটাই ছিল মানুষের পক্ষে একটা দুঃসাহস, কিন্তু তবুও জ্ঞানের প্রদীপ হাতে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর সংখ্যাল্পতা হয়নি। বিশ্বাসের সহজ অবলম্বনকে ছেড়ে দিয়ে যুক্তির শক্ত জমিতে যাঁরা পা দিতে চেয়েছিলেন—প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবুও সেই পথের আকর্ষণই যুগে যুগে মানুষকে টেনেছে। এমনি এক তীর্থঙ্কর পথিক ছিলেন কোপারনিকাস। বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রথম সূত্রটির সন্ধান তিনিই দিয়ে গেছেন।

অবশ্য এই সূত্রটিকে আবিষ্কার করবার জন্যে কোপারনিকাসকে ত্রিশটি বছর অতন্দ্র একাগ্রতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করতে হয়েছে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তিনি এসে বাস করতে লাগলেন এক অখ্যাত গ্রামে। তখনো পর্যন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। চল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ় শুধু নিজের দৃষ্টিশক্তির উপর

নির্ভর করে যাত্রা শুরু করলেন অসীম আকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের দুর্গম পথে। দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে বছর—নিরবচ্ছিন্ন সেই সাধনা। ১৫০৯ ও ১৫১১ সালের চন্দ্রগ্রহণ, ১৫১২ ও ১৫১৮ সালে মঙ্গলগ্রহের এবং ১৫২০ সালে বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের অবস্থান, ১৫২৫ সালে বুধ ও চন্দ্রের সংযোগ—জ্যোতিষ্কলোকের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য একটা সূত্রবদ্ধতাকে আবিষ্কার করলেন। শুধু চোখের দেখায় নয়, আঁক কষেও। চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সত্তর বছরের বার্ধক্যে পৌঁছে অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে বিশ্বলোকে এই পৃথিবী স্থিতিশীল নয়, অনন্ত মহাশূন্যে এই পৃথিবীও আবর্তিত হয়ে চলেছে।

কোপারনিকাসের সিদ্ধান্ত ছিল এই: সূর্য হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র। সূর্যের চারদিকে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার এই ঘোরাটাও ঠিক সাধারণ ঘোরা নয়, দরবেশী নাচের মতো পাক খেতে খেতে ঘোরা। বা, মনে করা যেতে পারে, লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে ঘোরা। আর পৃথিবী একা নয়, তার এই দরবেশী নাচের আসরে দোসর আছে আরো অনেকে। নেপচুন, ইউরেনাস, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র ও বুধ—প্রত্যেকটি গ্রহ এমনি ভাবে সূর্যের চারদিকে পাক খেতে খেতে ঘুরছে।

এই নতুন বিশ্বতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে কোপারনিকাসের বই যেদিন প্রকাশিত হল সেদিন তিনি মৃত্যুশয্যায়। ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে তাঁর মৃত্যু হয়। তার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই তিনি পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। বইটি প্রকাশ করার ভার ছিল তাঁর এক বন্ধুর উপরে। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, বন্ধুটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন: "কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে পরিবেশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি লেখা নয়—বইটি নেহাতই কল্পনাবিলাস।" সারা জীবনের সাধনার এই অমর্যাদা দেখে কোপারনিকাস উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তার আগেই তাঁর কণ্ঠ চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কোপারনিকাসের পরে গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর জীবন-কাহিনী বিচিত্র, প্রতিভা বহুমুখী। গতিবিজ্ঞানের বহু তত্ত্বকে প্রথম সূত্রবদ্ধ করার কৃতিত্ব গ্যালিলিওর। পিসার হেলানো গম্বুজ থেকে একটি আধ-সেরি এবং একটি পাঁচ-সেরি লোহার গোলক ফেলে তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে ওজন যাই হোক না কেন—পৃথিবী সব জিনিসকেই সমানভাবে টানে। কিন্তু গ্যালিলিওর সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। গ্যালিলিও নিজেও হয়তো কল্পনা করতে পারেননি, তাঁর আবিষ্কৃত সেই চোঙের মতো যন্ত্রটি মাত্র তিনশো বছরের মধ্যে মহাবিশ্বের দ্বার খুলে দেবে মানুষের চোখের সামনে, মানুষের দৃষ্টির দিগন্তরেখায় নিয়ে আসবে আশ্চর্য এক ব্যাপ্তি। আবার একথাও হয়তো গ্যালিলিও কল্পনা করতে পারেননি যে তাঁর নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রটিই হবে অশেষ নির্যাতন ও নিগ্রহের মূল কারণ। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অগস্ট ভেনিসের কাম্পালিন পাহাড়ের চুড়োয় গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল আর ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ গ্যালিলিওর ডাক পড়ে পাদরিদের বড়কর্তা কার্ডিনাল বেলার্‌মিনের বিচারকক্ষে। পুরো সাতটি বছরও নয়। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই গ্যালিলিও জ্যোতিষ্কলোকের আশ্চর্য সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তিনি দেখলেন, সারা আকাশে আরো অজস্র নক্ষত্র আছে যা সাদা চোখে দেখা যায় না। চারটি নতুন গ্রহকে তিনি আবিষ্কার করলেন। আর সব চেয়ে বড়ো কথা—তাঁর নির্ভুল ধারণা হল, গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এবং পৃথিবীও এমনি একটি ঘূর্ণ্যমান গ্রহ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে সত্য ধরা পড়েছিল তা কার্ডিনালের এক ধমকে উল্‌টিয়ে গেল। কার্ডিনাল ডিক্রি জারি করলেন যে সূর্য-গ্রহ ইত্যাদির গতিবিধি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা। গ্যালিলিওকে স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে তিনি অতঃপর সূর্য-গ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্বাক

থাকবেন। মনে হল, কার্ডিনালের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একদল গ্রহ দুষ্টু ছেলের মতো সূর্যের চারদিকে পাক খেতে শুরু করেছিল—টের পেয়ে কার্ডিনাল মশাই কান মলে দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত কার্ডিনালের কানমলাতেও কোন কাজ হয়নি। গ্যালিলিও সমানে তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন, তবে পরীক্ষার ফলাফলের কথা কারও কাছে প্রকাশ করলেন না। কিন্তু বীজকে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেও একদিন না একদিন পল্লবিত হয়ে উঠবেই। তেমনি পরীক্ষিত সত্যকে কোন কার্ডিনালের ধমক চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিও আবার একটি বই লিখলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার কার্ডিনালের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হল। তাঁর জীবনের শেষ ক-টি বছর কেটেছিল কারাগারের অন্ধকার গর্ভে। কার্ডিনালের কড়া হুকুম ছিল, গ্যালিলিওকে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অন্ধকার কারাগারে বসেই তিনি জীবনের শেষ বই লিখলেন— "গতিবিজ্ঞান"। বইয়ের পাণ্ডুলিপি গোপনে নিয়ে যাওয়া হল হল্যাণ্ডে এবং সেখানেই সেটি প্রকাশিত হল। তবে মুদ্রিত বইটি গ্যালিলিও চোখ মেলে দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন।

তারপরে তিনটি শতাব্দী পার হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের দেশের একজন স্কুলের ছেলেও জানে, পৃথিবী একটি গ্রহ মাত্র। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, পৃথিবীর মতো এমনি আরো আটটি গ্রহ নিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডল। দিনরাত্রি কেন হয়, শীতের পরে কেন গ্রীষ্ম আসে, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ হবার কারণ কী— এসব প্রশ্ন শুনে আজকের দিনে কোন পাদ্রি বলবে না যে এসব প্রশ্নের জবাব জানতে চাওয়ার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া। মাত্র তিনটি শতাব্দীর মধ্যে শুধু যে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা নয়—মানুষের মনও প্রসারিত হয়েছে। আজ

দেখা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো শহরে যেমন তৈরি হয় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, তেমনি তৈরি হয় মানমন্দির। দৈত্যের মতো বিপুলাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের গবাক্ষপথে ধরা পড়ে কোটি কোটি যোজন দূরের দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিষ্কলোক। তারপরেও আরো দূরের জগতকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পাল্লায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলেছে। আজকের দিনে এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। আর আজ থেকে তিনশো বাইশ বছর আগে একজন মানুষ শুধু জানাতে চেয়েছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে ; এইটেই তাঁর মস্ত অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং এজন্যে তাঁকে চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল ! এই ঘটনার মর্মান্তিকতা উপলব্ধি করা আজকের দিনের মন নিয়ে হয়তো সহজসাধ্য নয়।

বাহির বিশ্ব

আজি ক্ষণেকের তরে   বসি বাতায়ন—'পরে
বাহিরেতে চাহো।
অসীম আকাশ হতে   বহিয়া আসুক স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ ॥

কথায় বলে, কল্পনায় ভর করে মানুষ যেতে পারে না এমন জায়গা নেই। কিন্তু মানুষের উদ্দাম কল্পনারও একটা সীমা আছে। কোন লোককে যদি বলা হয়, চলো মনে মনে লণ্ডন শহর থেকে ঘুরে আসি—তাহলে সে কী করে? লণ্ডনকে যারা চাক্ষুষ দেখে এসেছে তাদের বিবরণের উপর নির্ভর করে কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয়, চলো মনে মনে মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুরে আসি—তাহলে দেখা যাবে, মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে একটা পুরোপুরি আজগুবী কল্পনা করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ, কল্পনার ডানা মেলতে হলেও কিছুটা বাস্তব আশ্রয় চাই। যে লোক কোন দিন গাড়ির চাকা দেখেনি সে চেষ্টা করলেও রেলগাড়ি আঁকতে পারবে না। এড্গার এ্যালান পো বা এইচ-জি-ওয়েল্স্-এর মতো প্রখর-কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লেখকরাও মানুষকে চাঁদে নিতে গিয়ে কল্পনার দিক থেকে না হতে পেরেছেন বাস্তব, না হতে পেরেছেন উদ্ভট। তাঁরা যে যুগে বই লিখেছেন সে-যুগে তাঁদের পক্ষে এইটিই ছিল সীমানা।

কিন্তু আজকের দিনে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থা। এই মুহূর্তেই আমরা অনায়াসে স্থির করতে পারি—গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রলোকে একবার বেড়িয়ে আসা যাক। দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্র আর গণিতের

আঁকজোক যেভাবে বহুদূরের নক্ষত্রকেও টান মেরে আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে এসেছে তাতে এই বিশ্বভ্রমণ সেরে আসবার জন্যে খুব বেশি কল্পনারও আশ্রয় নেবার দরকার নেই। কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার যেতে হলে যতোটা প্রস্তুতি ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তার চেয়েও অনায়াসে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা পাক দিয়ে আসা চলে।

সুতরাং কল্পনা করা যাক, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও গাণিতিক আঁকজোক দিয়ে তৈরি একটা রকেটে আমরা চেপে বসেছি আর রকেট ছুটে চলেছে হাওয়া দিয়ে মোড়া এই পৃথিবী ছাড়িয়ে।

বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে আমাদের রকেটের গতি যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল হয় তাহলেই তা পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যের দিকে পাড়ি দিতে পারে। অর্থাৎ, সেকেণ্ডে সাত মাইল গতি হলে পরেই আমাদের ছোটার জোরটা পৃথিবীর টানের জোরের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এসব অঙ্কের হিসেবের মধ্যে পরে আসা যাবে, আপাতত আমাদের রকেট ছুটে চলুক।

কিন্তু প্রথম কয়েকটা সেকেণ্ড পার হবার পরেই আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হবে। আকাশের রঙ বদলে যাচ্ছে। অল্পে অল্পে একটু একটু করে নয়—দ্রুত, আচমকা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ হয়ে উঠবে মধ্যরাত্রির মতো কালো আর সেই কালো আকাশে ফুটে উঠবে রাত্রির তারা। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে যেমন তারার ঝিকিমিকি দেখা যায়—এ-দৃশ্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তারাগুলোকে মনে হবে স্থির আলোর এক-একটা দ্যুতিমান বিন্দু—তীরের ফলার মতো সরাসরি এসে চোখে বিঁধছে। আর সূর্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে সূর্য হয়ে উঠেছে আগুনে তাতানো ইস্পাতের মতো সাদা, ছায়া পড়ছে রূপকথার দৈত্যের মতো কর্কশ আর হিংস্র। সূর্যের আলোকে মনে হবে আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহের মতো—আর সেই লাভাপ্রবাহ পৃথিবীর সমস্ত রঙ নিঃশেষে মুছে দিয়ে গেছে যেন।

আমাদের রকেট এগিয়ে চলুক, ইতিমধ্যে আমরা জেনে নিই ব্যাপারটা কেন ঘটে। কল্পনা করা যাক, সমুদ্রের মাঝখান থেকে একটা আলোকস্তম্ভ উঠেছে আর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সেই স্তম্ভের গায়ে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্তম্ভটির গায়ে ধাক্কা খাবার পরেও খুব বড়ো বড়ো ঢেউয়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না। যেমন, সৈন্যবাহিনী যদি রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলে আর ঠিক রাস্তার উপরে যদি একটা গাছ থাকে—তাহলে সেই গাছের সামনে এসে সৈন্যবাহিনী ডাইনে-বাঁয়ে দু-ভাগ হয়ে যায় এবং গাছটিকে পেরিয়ে যাবার পরে আবার মেলে একসঙ্গে। তেমনি বড়ো বড়ো ঢেউও ডাইনে-বাঁয়ে দু-ভাগ হয়ে গিয়ে স্তম্ভটিকে পার হয়ে যায় এবং স্তম্ভটি পার হয়ে যাবার পরেই এই দুটি ভাগ আবার জোড়া লাগে। কিন্তু ছোট ঢেউ? ছোট ঢেউগুলি স্তম্ভকে পেরিয়ে যেতে পারে না। স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিট্‌কিয়ে পড়ে। ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে সূর্যের আলোর বেলাতেও। সূর্যের আলো হচ্ছে সমুদ্র আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আলোকস্তম্ভ। সূর্যের আলোর মধ্যে নানা আকারের ঢেউ আছে—খুব ছোট থেকে খুব বড়ো। আবার একেক আকারের ঢেউয়ের আলোর একেক রকম রঙ। বড়ো ঢেউগুলোর রঙ হচ্ছে লাল, ছোট ঢেউগুলোর রঙ নীল। নানা ঢেউয়ের এবং নানা রঙের সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলে এসে ধাক্কা খায় তখন বড়ো ঢেউয়ের লাল আলো অনায়াসেই সেই বাধাকে পেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু ছোট ঢেউয়ের নীল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিট্‌কিয়ে পড়ে।

এবারে যে কোন একটা নীল আলোর ঢেউকে অনুসরণ করা যাক। বায়ুমণ্ডলে এসে ধাক্কা খাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আবার সেই প্রত্যেকটি গুঁড়ো অনবরত চারদিকে ধাক্কা খেতে থাকে। এইভাবে চারদিক থেকে ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত এসে যখন পৃথিবীতে পৌঁছয় তখন তার গতির কোন নির্দিষ্টতা থাকে না—আকাশের চারদিক

থেকে সেই নীল আলো ঝরে পড়ছে বলে মনে হয়। আর তাই আকাশকে মনে হয় নীল। সূর্যকে দেখায় লাল। আসলে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের যে রঙ আমরা দেখি সেটা তার আসল রঙ নয়। সূর্যের আলো থেকে নীল রঙের বেশির ভাগটাই বায়ুমণ্ডল ছেঁকে বার করে নেয়—বাকি যেটুকু থাকে তাই আমরা দেখি। বায়ুমণ্ডলের বাধা যতো বেশি হবে সূর্য হবে ততো বেশি লাল। এইজন্যেই ভোরে ও বিকেলে, কুয়াশার দিনে বা পাতলা মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে মনে হয় যেন টকটকে সিঁদুরের মস্ত একটা টিপ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ে আকাশের মেঘে মেঘে যে অপরূপ বর্ণলিপি ফুটে ওঠে তা এই বায়ুমণ্ডলের সংহারমূর্তির জন্যেই। সূর্যের আলোর কয়েকটা ঢেউ বায়ুমণ্ডলের ধাক্কায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় বলেই ভোরবেলা দূরের পাহাড়ের চূড়োয় লাল রঙের ছোপ পড়ে, সন্ধ্যার আকাশ হয়ে ওঠে আপেলের মতো সবুজ। আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এসে প্রথম দেখা যায় সূর্যের আসল রঙ—নীলাভ আলোর একটা দ্যুতিমান পিণ্ড। আর আকাশের রঙ নেই—শুধু মহাশূন্যের অতল অন্ধকার।

এবার দেখা যাক আমাদের রকেট কোথায় এসে পৌঁচেছে।

আমাদের রকেটের গতি যদি হয় ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার মাইল, তাহলে প্রায় দশ ঘণ্টা পরে আমরা এসে পৌঁছব চাঁদে। কিন্তু তখনো সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হবে, সূর্য তেমনি দূরেই রয়ে গেছে। প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল পথ পেরিয়ে আসার পরেও সূর্য চোখে-পড়বার-মতো কাছে আসেনি বা বড়ো হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীকে দেখাচ্ছে একটা থালার মতো—আবছায়া, অস্পষ্ট। দূর থেকে চাঁদকে যেমন ঝকঝকে ও স্পষ্ট দেখায়, তেমন নয়। এমনি দেখাবার কারণ, পৃথিবী রয়েছে হাওয়ার মোড়কের মধ্যে। সেই হাওয়ার মধ্যে চলেছে মেঘ-কুয়াশা-ঝড়বৃষ্টি-তুষারপাতের মাতামাতি। সূর্যের আলো

পৃথিবীর গা থেকে সরাসরি ঠিকরে আসতে পারে না। তীর্থস্থানে ঠাকুরকে দর্শন করতে হলে যেমন পাণ্ডাদের প্রণামী দিতে হয় তেমনি পৃথিবীকে ছোঁবার জন্যে যাতায়াতের পথে সূর্যের আলো হাওয়ার প্রতিটি কণাকে মাশুল দিয়ে চলে। এইজন্যেই দূর থেকে পৃথিবী এমন ঝাপসা ও অস্পষ্ট। আর চাঁদ হচ্ছে রাস্তার ধারের পাথরের মূর্তির মতো। তার চারধারে হাওয়ার দেওয়াল নেই, সুতরাং ধূলোর কণা পুরুত-পাণ্ডারা অনুপস্থিত। সূর্যের আলো অবাধে সেই পাথরের মূর্তির কাছে হাজির হয় এবং সেই মূর্তির একটা অবিকৃত ছাপ তুলে নিয়ে ফিরে আসে। এইজন্যেই চাঁদ এত ঝকঝকে ও স্পষ্ট। পৃথিবীতে কেন হাওয়া আছে আর চাঁদে কেন হাওয়া নেই—এ আলোচনায় আমরা পরে আসব। আপাতত আমাদের রকেট চাঁদে নামুক, দেখে নেওয়া যাক চাঁদটা পৃথিবীর মতোই মাটি দিয়ে তৈরি কিনা।

মাটির সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে জলের কথা। চাঁদে যে একফোঁটাও জল নেই—সে-বিষয়ে কিন্তু অনেক আগে থেকেই নিশ্চিত ধারণা করে নেওয়া চলে। নদী, নালা, খাল, বিল, সমুদ্র—এসবের অস্তিত্ব যে চাঁদে নেই তা জানবার জন্যে চাঁদের মাটিতে পা দেবার দরকার হয় না। চাঁদে যদি জল থাকত তবে সূর্যের আলোয় সেই জল ঝল্‌সে উঠত কাচের মতো। অনেক দূর থেকেই দেখা যেত সেই ঝল্‌সানো কাচকে। কিন্তু চাঁদের মাটিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও এই ঝল্‌সানো কাচকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের রকেট আরো কাছে এগিয়ে এলে টের পাওয়া যাবে, চাঁদে শুধু যে জল নেই তা নয়—গাছপালা নেই, চষা মাঠ নেই, জীবনের কোন চিহ্ন নেই। শুধু ধূ ধূ করছে মরুভূমি, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড এক-একটা গহ্বর, মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু পাহাড়। মনে হবে, সারা চাঁদ জুড়ে দীর্ঘকাল আগ্নেয়গিরির তাণ্ডব চলেছিল। এখন সেই জগৎ মৃত; শুধু অজস্র ক্ষতচিহ্নে সর্বাঙ্গ বীভৎস হয়ে রয়েছে।

তবে চাঁদের দেশের পাহাড় আর পর্বতের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়বে। কোথাও এতটুকু মসৃণতা নেই। সারা গা থেকে এবড়ো-খেবড়ো দাঁত বেরিয়ে আছে। কোথাও ধারালো ছুঁচের মতো, কোথাও মস্ত এক-একটা পিণ্ডের মতো। যেন এক খামখেয়ালী শিশু একতাল মাটি নিয়ে খুশিমতো নাড়াচাড়া করেছে। সে-তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী কত সুগোল আর নিটোল! যেন দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া অপরূপ প্রতিমা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের এই পৃথিবীর উপরে বরফ চলাচল করেছে, বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়েছে, হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগেছে। একটু একটু করে ক্ষয় হয়েছে পৃথিবী, একটু একটু করে আবার গড়েও উঠেছে। এই ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মোট ফল পৃথিবীর উপরিতলের মসৃণতা ও গঠনগত সুষমা। বরফ বৃষ্টি আর হাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর রূপকার।

এবার আলোচনা করা চলতে পারে, চাঁদে কেন হাওয়া নেই। এ-খবর হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের একদিকের অর্ধাংশই বরাবর দেখে আসছি, অন্য অর্ধাংশ আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। চাঁদের এই একদিকের খুশি ও অন্যদিকের অভিমানের কারণটা কিন্তু খুবই সাধারণ। প্রায় একমাস সময়ের মধ্যে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আর এই একই সময়ের মধ্যে একবার দরবেশী নাচের পাক খায়। এই দুয়ের যোগাযোগে চাঁদের এদিকের সঙ্গে আমাদের মুখ দেখাদেখি নেই। আবার সূর্যের দিক থেকে তাকিয়ে দেখলে পৃথিবী ও চাঁদ অনবরত জায়গা বদল করে বলেই পৃথিবীর চোখে চাঁদের ষোল-কলা রূপ।

পূর্ণিমার রাত্রে আকাশের কপালে মস্ত একটা টিপের মতো ঝক্‌ঝকে চাঁদকে চোখের দেখায় সূর্যের মতোই বড়ো মনে হয়—আসলে কিন্তু তা নয়। এটা ঘটে আমাদের চোখের দেখার ত্রুটির জন্যে। দূরে থাকলে আমরা বড়ো জিনিসকেও ছোট দেখি। আর কাছে থাকলে আমরা ছোট জিনিসকেও বড়ো দেখি। পৃথিবী, চাঁদ

আর সূর্য হচ্ছে তিনটি গোলক, আর এই তিনটি গোলকের আকার সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা হতে পারে যদি গোলক তিনটির ব্যাস জানা যায়। বৈজ্ঞানিকদের হিসেব থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল, চাঁদের ব্যাস ২,১৬০ মাইল আর সূর্যের ব্যাস ৮,৬৪,০০০ মাইল। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯,৩০,০৯,০০০ মাইল। এইসব হিসেব থেকে সোজা কথাটা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই : সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চেয়ে চারশো গুণ বেশি এবং পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০৯ গুণ বেশি। অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় সূর্য চাঁদের চেয়ে শুধু যে চারশো গুণ বেশি দূরে আছে তা নয়, চাঁদের চেয়ে আকারেও চারশো গুণ বড়ো। সূর্য মহাশূন্যের যতোটা জায়গা জুড়ে আছে তার মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ পৃথিবীকে এবং প্রায় সাড়ে-ছয় কোটি চাঁদকে পুরে রাখা চলে।

কথায় কথায় আমরা আমাদের মূল আলোচনা থেকে সরে এসেছি। আমাদের প্রশ্ন ছিল : চাঁদে কেন হাওয়া নেই? এই প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো বুঝতে হলে বিশ্বজগতের আরেকটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। এই নিয়মটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ জিনিসটা কি?

এক টন ওজনের কোন জিনিসকে কি কোন মানুষ দু-হাতে তুলতে পারে? পারে না। পারে না, কারণ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। জিনিসটাকে পৃথিবী টেনে ধরে আছে ; আর এক টন ওজনের বেলায় পৃথিবীর টানের জোরের চেয়ে মানুষের হাতের জোর কিছুতেই বেশি হতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন নিউটন। গল্পে আছে, তিনি নাকি একদিন একটা আপেল ফলকে গাছ থেকে মাটিতে পড়তে দেখে ভাবতে শুরু করেন : আপেল ফল মাটিতে পড়ে কেন? কেন আকাশের দিকে উড়ে যায় না? ভাবতে ভাবতে তিনি একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুলেন : বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে নিজের দিকে

টানছে। এই টানের জোর নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর—বস্তুর ভর ও দুই বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব। ভর বাড়লে বা দূরত্ব কমলে টানের জোর বাড়ে এবং ভর কমলে বা দূরত্ব বাড়লে টানের জোর কমে। যেখানেই বস্তু আছে সেখানেই টান আছে, বস্তু ছাড়া টান হয় না, টান ছাড়া বস্তু হয় না। বস্তুজগতের এই টানের নাম দেওয়া হয়েছে মাধ্যাকর্ষণ। আর টানের জোরকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে রাখা ভালো। বস্তুর টানকেই বলা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু ইঞ্জিন যেমন মাল-গাড়িকে টানে—এই টানটা সেই জাতের নয়। বস্তুর টানের এই নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে। দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো কথাটা একটু স্পষ্ট হবে। চুম্বক লোহাকে টানে বা দুই বিপরীতধর্মী চুম্বক পরস্পরকে টানে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই এই টানের মাঝখানে আড়াল তুলে দেওয়া যায়। এক বস্তুর আলো ও উত্তাপ অপর বস্তুতে পৌঁছতে সময় লাগে এবং ইচ্ছে করলে বাঁধ তুলে বন্যা আটকাবার মতো এই আলো ও উত্তাপকেও আড়াল তুলে ঠেকিয়ে রাখা চলে। কিন্তু দুই বস্তুর টানাটানি কোন আড়াল মানে না বা সময়ের পরোয়া করে না। আকাশে এমন নক্ষত্রও আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছে কিন্তু যার টানের ফাঁসে সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই পৃথিবী বাঁধা। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের একটি বহুপঠিত উপন্যাস আছে—'দি ফার্স্ট মেন ইন্ দি মূন' (চাঁদে প্রথম মানুষ)। তাঁর উপন্যাসের নায়ক আশ্চর্য একটা ধাতু আবিষ্কার করে যার উপরে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কার্যকরী নয়। এ্যাস্‌বেস্‌টস্ যেমন উত্তাপকে ঠেকিয়ে রাখে তেমনি এই ধাতু মাধ্যাকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। এই বিশেষ ধাতুর তৈরি একটি ব্যোমযানে চেপে তাঁর উপন্যাসের নায়ক চাঁদে যাত্রা করেছিল। এই ব্যোমযানের চারপাশে ছিল খড়খড়ি। কোন এক দিকের খড়খড়ি খুলে ধরলেই সেই দিক থেকে মাধ্যাকর্ষণের

শক্তি টান মারতে থাকে ; যেমন এ্যাস্‌বেস্‌টসে ফুটো হলে সেই ফুটো দিয়ে উত্তাপ চলাচল শুরু হয়ে যায়। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়ে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কার্যকরী নয় এমন কোন ধাতুর অস্তিত্ব থাকা একেবারেই অসম্ভব। মাধ্যাকর্ষণের টানটা সাধারণ টানের মতো নয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের টান। এই টানের বিরুদ্ধে কোন আড়াল নেই। মানুষ যদি এমন কোন ব্যোমযান আবিষ্কার করতে পেরে থাকে যার গতির জোর পৃথিবীর টানের জোরের চেয়ে বেশি—একমাত্র তাহলেই চাঁদে বা পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোন গ্রহে যাওয়া সম্ভব।

এই মাধ্যাকর্ষণের টান আর গতির জোরের ব্যাপারটা যদি আমরা ঠিকমতো বুঝতে পেরে থাকি—তাহলে আমাদের মূল প্রশ্নের জবাব পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। আগেই বলেছি, চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। সুতরাং চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টানও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের চেয়ে অনেক কম। হিসেব করে দেখা গেছে, যে-মানুষ পৃথিবীতে ছ-ফুট হাইজাম্প দিতে পারে সে চাঁদে গিয়ে ছত্রিশ ফুট হাইজাম্প দেবে। পৃথিবীতে আড়াই মন ওজন যে তুলতে পারে, চাঁদে গিয়ে সে তুলবে পনেরো মন। ঠিক তেমনি পৃথিবীর কোন খেলোয়াড় যদি একটা ফুটবলে লাথি মেরে একশো ফুট উঁচুতে তুলতে পারে তবে চাঁদে সে তুলবে ছ-শো ফুট। চাঁদ যদি আরও ছোট হত, অর্থাৎ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ যদি আরও কম হত, তবে সেই একই লাথির জোরে ফুটবল উঠে যেত আরো অনেক উঁচুতে। আর ফুটবল না হয়ে যদি হয় কামানের গোলা—তাহলে ? পৃথিবীতে যে কামানের গোলা দু-মাইল উঁচুতে উঠতে পারে, চাঁদে তা উঠবে বারো মাইল। কামান দাগবার জোর যতো বাড়বে কামানের গোলাও ততো উঁচুতে উঠবে। কল্পনা করা যাক্‌, কামান দাগবার জোর ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলেছে। কামানের গোলাও ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতেই উঠবে। এই ব্যাপারটা চলতে চলতে

এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব কিনা যখন কামানের গোলাটা আর ফিরে আসবে না—মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে? বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন, এমন অবস্থায় পৌঁছনো খুবই সম্ভব। কামানের নল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যদি কামানের গোলা সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছোটে তাহলে সেই ছোটার জোরটা পৃথিবীর টানের জোরের চেয়ে বেশি হয়ে যায়—সেক্ষেত্রে কামানের গোলাটা পৃথিবীতে ফিরে না এসে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায়। আর চাঁদের বেলায় ছোটার জোর এত বেশি না হলেও চলে। সেখানে সেকেণ্ডে দেড় মাইল বেগে ছুটতে পারলেই কামানের গোলা উধাও হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর হাওয়া যে পৃথিবীর গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে আর চাঁদের হাওয়া যে উধাও—তার কারণটা হচ্ছে এই।

পৃথিবীর হাওয়ার মধ্যে যেমন আছে একাধিক মৌলিক পদার্থের কণা, তেমনি আছে ধুলো ও বাষ্পের কণা। এই কণাগুলো কোন সময়েই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, অনবরত ছুটোছুটি গুঁতো-গুঁতি করে। আবার দিনের বেলা হাওয়া যতো গরম হতে থাকে, এই কণাগুলোর ছুটোছুটিও ততো বেড়ে যায়। পৃথিবীতে হাওয়া-কণার এই দৌড়-ছুটের বেগ কোন সময়েই সেকেণ্ডে সাত মাইলের কাছাকাছি আসে না। অর্থাৎ পৃথিবীর টানের জোর হাওয়ার গতির জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশিই থেকে যায়। কাজেই পৃথিবীর হাওয়া যতোই ঝাপ্‌টে বেড়াক না কেন, অদৃশ্য একটা টানে তাকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গেই লেপ্‌টে থাকতে হয়।

কিন্তু চাঁদে অন্য ব্যাপার ঘটে। আগেই বলেছি, প্রায় পনেরো দিন ধরে চাঁদের একদিকে দিনের আলো, অন্যদিকে রাতের অন্ধকার। দিনের দিক সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত হতে হতে শেষকালে ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, দিনের চাঁদে ২৪৪° ফারেনহিট্ পর্যন্ত উত্তাপ উঠতে পারে। চাঁদে যদি হাওয়া থাকত তবে এই প্রচণ্ড উত্তাপে হাওয়ার কণাগুলো এমন অস্থিরভাবে

ছুটোছুটি শুরু করে দিত যে সেই ছুটোছুটির বেগ সেকেণ্ডে দেড় মাইলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া খুব একটা শক্ত ব্যাপার হত না। আর তাছাড়াও কথা আছে। চাঁদ কয়েক লক্ষ বছর ধরে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আজকের জমাট অবস্থায় পৌঁচেছে। সুতরাং এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল যখন গোটা চাঁদটাই ছিল ভয়ানক উত্তপ্ত অবস্থায়। সে-সময়ে চাঁদে যদি হাওয়া থেকেও থাকে তবে তার ছুটোছুটির বেগটাও হয়েছিল প্রচণ্ড। সেকেণ্ডে দেড় মাইলের চেয়ে অনেক বেশি। আর হাওয়ার কণার বেগ সেকেণ্ডে দেড় মাইল হলেই তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা চাঁদের থাকে না। হাওয়ার গতির জোরটা চাঁদের টানের জোরের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার কণা অসীম শূন্যে উধাও। এইভাবে চাঁদের সমস্ত জল বাষ্প হয়ে গিয়ে উবে গেছে। সেই বাষ্প কোন সময়েই বৃষ্টি হয়ে চাঁদের বুকে ঝরে পড়েনি। সেই বাষ্পের কণা অতি অনায়াসেই চাঁদের টানকে অগ্রাহ্য করে পাড়ি দিয়েছে শূন্যে।

আবার চাঁদের যেদিকে দিন সেদিকে যেমন ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি উত্তাপ, তেমনি চাঁদের যেদিকে রাত সেদিকে হিমাঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি ঠাণ্ডা। বৈজ্ঞানিকদের মতে রাতের চাঁদে উত্তাপ নেমে আসে—২৪৪° ফারেনহিট পর্যন্ত। অর্থাৎ, ফুটন্ত জলের তুলনায় বরফ যতোটা ঠাণ্ডা, বরফের তুলনায় এটা তেমনি ঠাণ্ডা।

তবে একটা বাঁচোয়া আছে। চাঁদের দেশে উত্তাপের যা-কিছু ওঠা-নামা সবই চাঁদের মাটির উপরে ; মাটির নিচে এই ওঠানামার ধাক্কা কিছুমাত্র পৌঁছতে পারে না। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রায় পনেরো দিন ধরে সূর্যের আলোয় ঝল্‌সে যাবার পরে যেখানে চাঁদের মাটির উপরের দিকটা ফুটন্ত জলের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেখানেও মাত্র সিকি ইঞ্চি মাটির নিচেও তখনো উত্তাপ থাকে হিমাঙ্কের নিচে। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে দেখা গেছে, চাঁদের উত্তাপ অতি দ্রুত ওঠানামা করে। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে পৃথিবী থাকে সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে, আর পৃথিবীর ছায়া গিয়ে পড়ে চাঁদের উপরে।

বৈজ্ঞানিকরা অতি সূক্ষ্ম সব যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণের সময়ে চাঁদের উত্তাপ মেপেছেন। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, চাঁদের উত্তাপ দ্রুত নামতে থাকে। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের প্রকাশিত তথ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গ্রহণের আগে চাঁদের উত্তাপ ছিল ১৯৪° ফা. ; গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তা আচমকা নেমে আসে—১৫২° ফা.-এ ; অর্থাৎ, হিমাঙ্কেরও ১৮৪° নিচে। কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই মোট ৩৪৬° উত্তাপ নেমে আসা পৃথিবীতে একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার। পৃথিবীতে দিনের পর রাত আসে বা সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যায়—তখনো উত্তাপ কমতে থাকে অতি ধীরে ধীরে। পৃথিবীর ব্যারোমিটারে পারার স্তম্ভের ওঠানামায় খুব বেশি অস্থিরতা নেই। তার কারণ, দিনের বেলা পৃথিবীর মাটি সূর্যের অনেকখানি উত্তাপ নিজের মধ্যে ধরে রাখে আর রাত্রিবেলা মায়ের স্নেহের মতো একটু একটু করে ছড়িয়ে দেয় তা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, চাঁদের মাটি উত্তাপ ধরে রাখতে পারে না। নানাভাবে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন, আসলে চাঁদের মাটি হচ্ছে আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষ ছাড়া কিছু নয়।

এতক্ষণ ধরে চাঁদের যে চেহারা দেখতে পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা যায়, চাঁদের দেশটা বেড়াতে আসার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। জল নেই, হাওয়া নেই, মাটি ও আকাশের রঙ নেই—আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষ দিয়ে মোড়া নিষ্প্রাণ এক জগৎ। চারদিকে শুধু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়, অমসৃণ জমি ও বড়ো বড়ো গহ্বর! এক-একটা গহ্বর এত বড়ো যে কলকাতার মতো এক-একটা শহরকে তার মধ্যে পুরে রাখা চলে। আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। হাজার চেষ্টা করলেও সেখানে এতটুকু শব্দের কম্পন তোলা যাবে না।

তাছাড়া চাঁদের দেশে আরেকটা মস্ত বিপদ আছে। তা হচ্ছে উল্কাপাত। চাঁদের উল্কাপাত পৃথিবীর উল্কাপাতের মতো একেবারেই নয়। পৃথিবী থেকে উল্কাপাতকে দেখে মনে হয় যেন আকাশ থেকে

একটা তারা খসে পড়ছে। আসলে ব্যাপারটা যা ঘটে তা হচ্ছে এই : মহাশূন্যে অসংখ্য বস্তুকণা আছে এবং সূর্যের প্রদক্ষিণপথে পৃথিবী মাঝে মাঝে এই সব বস্তুকণার ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ে। আর তখন পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণের অদৃশ্য সুতো দিয়ে বস্তুকণাকে টান মারে নিজের দিকে আর এই অদৃশ্য টানে বস্তুকণাগুলো প্রচণ্ড-বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। প্রতিদিনে পৃথিবীর উপরে অসংখ্য উল্কাপাত হয়ে চলেছে কিন্তু সব সময়ে আমরা তা টের পাই না। এই পৃথিবী মায়ের মতো হাওয়ার আঁচল দিয়ে আমাদের ঢেকে রেখেছে। সমস্ত উল্কাই এই আঁচলে এসে আটকে যায়, আঁচল ফুটো করে আমাদের গায়ে এসে লাগতে পারে না। অর্থাৎ, বস্তুকণাগুলো পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে আসতে হাওয়ার রাজ্যে এসে যখন পৌঁছয় তখন প্রচণ্ড গতি সঞ্চয় করেছে। ফলে হাওয়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুকণায় আগুন জ্বলে ওঠে এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার আগেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে বস্তুকণা না হয়ে যদি বস্তুপিণ্ড হয় তাহলে যে কী ভয়ংকর কাণ্ড হতে পারে তার নজির ইতিহাসে আছে। ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে একটি উল্কা পড়েছিল। সেই উল্কাপাতের ফলে চারদিকের ২,০০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে নেমেছিল কল্পনাতীত এক ধ্বংসলীলা। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়, আর সেই উল্কাপাতের ফলে যে ঝড় ওঠে তার ফলে সাইবেরিয়ার আট কোটি গাছ খড়ের কুটোর মতো উড়ে যায়। এমনি উল্কাপাতের নজির আরো দু-একটা আছে। কিন্তু চাঁদের দেশে উল্কাপাতকে ঠেকাবার জন্যে মায়ের আঁচলের মতো হাওয়া নেই। সেখানে প্রত্যেকটি উল্কা মৃত্যুবাণের মতো চাঁদের মাটিতে নেমে আসে। আর মৃত্যুর মতোই নিঃশব্দ তার গতি। চাঁদের মাটিতে যে অজস্র ফাটল আর গহ্বর আছে, অনেকের মতে, তা এই উল্কাপাতের জন্যেই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুবাণে জর্জরিত হয়ে চাঁদের চেহারা হয়ে উঠেছে কুষ্ঠরোগীর মতো বিকৃত ও বীভৎস। দূর থেকে চাঁদকে দেখে

আমরা যতো কবিত্বই করি না কেন, তার সত্যিকারের চেহারা কবি-কল্পনাকেও হার মানাবে।
আর শুধু উল্কাপাতটাই একমাত্র বিপদ নয়। মায়ের আঁচলের মতো এই পৃথিবীর হাওয়া যে আরো কত মৃত্যুবাণকে ঠেকিয়ে রাখছে তা পুরোপুরি কল্পনা করাও হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেগুনি-পারের আলো, মহাজাগতিক রশ্মি বা এমনি আরো দু-একটা সাংঘাতিক রকমের মারাত্মক মৃত্যুবাণের অস্তিত্বের কথা তো আমরা এই পৃথিবীর মাটি থেকেই টের পাই। কিন্তু তা শুধুই টের পাওয়া, আর কিছুই নয়। পৃথিবীর হাওয়ার বাইরে মহাশূন্যে হাজির হলে এই সব মৃত্যুবাণের চেহারা যে কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর চাঁদের দেশে এই সমস্ত মৃত্যুবাণের প্রত্যেকটির অবাধ যাতায়াত। সুতরাং চাঁদে মানুষের যাওয়া নিয়ে উপন্যাস লেখা চলতে পারে, খানিকটা বিজ্ঞান ও খানিকটা কল্পনার রঙ মিশিয়ে ফিল্‌ম্‌ তোলা চলতে পারে—কিন্তু চাঁদের দেশে সত্যিকারের যাওয়াটা আরো অনেক বেশি শক্ত কাজ। চাঁদে যাওয়ার পথে যে-সব বাধাবিঘ্ন আছে তার পুরোপুরি চেহারাটাই এখনো জানা গেছে কিনা সন্দেহ। আরো কিছুদিন গভীর অনুসন্ধান চলবে শুধু এই পথের হদিশটুকু জানার জন্যেই।
কিন্তু আপাতত এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আমরা মহাশূন্য অভিযানে বেরিয়েছি কল্পনার রকেটে চড়ে। দূরপাল্লার অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর গণিতের আঁকজোক দিয়ে তৈরি আমাদের এই রকেট। অতএব আমাদের এগিয়ে চলতে বাধা নেই।
চাঁদের দেশ ছেড়ে আমাদের রকেট আবার পাড়ি দিক মহাশূন্যে।

পৃথিবীর সহযাত্রী

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে
যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।

এবারে আমাদের যাত্রা ভেনাসের উদ্দেশ্যে। প্রভাতের শুকতারা—আপন পরিচয় পাল্‌টিয়ে কখনো-বা দেখা দেয় "গোধূলির দেহলীতে"—সেই ভেনাস বা শুক্রগ্রহ।

শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর সহযাত্রী। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যে গ্রহ আসে তা হচ্ছে শুক্র ; আবার পৃথিবীর সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মিল আছে যে গ্রহের তাও শুক্র।

প্রথমে শুক্রগ্রহের ঠিকানা, বহর ও চৌহদ্দির একটা হিসেব নেওয়া যাক। এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু অঙ্কের গুণ-ভাগ, যা দিয়ে এই মহাকাশের ঠিকানা কিছুটা অন্তত জানা যায়।

সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব মোটামুটি ৬,৭৩,০০,০০০ মাইল। মোটামুটি বললাম এই কারণে যে সূর্যের প্রদক্ষিণপথে কখনো এই দূরত্ব কিছুটা বেশি হয়ে যায়, কখনো কিছুটা কমে। বাড়তির দিকে সংখ্যাটা গিয়ে পৌঁছয় ৬,৭৫,০০,০০০ মাইলে আর কমতির দিকে ৬,৬৫,০০,০০০ মাইলে। ঘণ্টায় ৭৮,১২০ মাইল বা সেকেণ্ডে ২১'৭ মাইল বেগে শুক্র সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। এক-একটা পাক দিতে সময় লাগে ২২৫ দিন। গ্রহটির ব্যাস ৭,৫৭৬ মাইল। অর্থাৎ আকারে শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সামান্যই ছোট ; তুলনা করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মাপ যদি ধরা হয় একশো, তবে শুক্রের মাপ হবে আটানব্বুই। সত্যিকারের মাপে শুক্রের চেয়ে পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৩৫০ মাইল বেশি। শুক্রের দিনরাত্রি আছে কিনা, থাকলে তার মাপ কত—এসব খবর নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। অনেকে বলেন, শুক্রের অর্ধাংশের সঙ্গে সূর্যের আলোর মুখ দেখাদেখি নেই। অর্থাৎ শুক্রের এক অর্ধাংশে চিরকাল দিন আর বাকি অর্ধাংশে চিররাত্রি। যদি তাই হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সূর্যের চারদিকে একবার পাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিজের চারদিকেও একবার দরবেশী নাচের পাক খায়। কিন্তু নানারকম পরীক্ষা করে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শুক্রগ্রহ তার ২২৫ দিনের বছরে বার সাতেক দরবেশী নাচের পাক খায়। তাই যদি হয় তো সাতটি দিন আর সাতটি রাত্রি নিয়ে শুক্রগ্রহের একটি বছর।

শুক্রগ্রহ আকারে যেমন পৃথিবীর তুলনায় এমন বিশেষ কিছু ছোট নয়—তেমনি ঘনত্ব ও ভরের দিক থেকেও এই দুই গ্রহের তফাৎ সামান্যই। জলের ঘনত্বকে যদি একক ধরা হয় তাহলে পৃথিবীর ঘনত্ব হচ্ছে ৫'৫২, আর শুক্রগ্রহের ঘনত্ব ৫'২১। এ থেকেই অনুমান করে নেওয়া চলে, দুটি গ্রহ যদি আকার ও ঘনত্বে ও প্রায় সমান হয়—তাহলে ভরের দিক থেকেও প্রায় সমানই হবে। আর হয়েছেও তাই। বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন যে পৃথিবীর ভরকে যদি ধরা হয় ১,০০০, তাহলে শুক্রগ্রহের ভর হবে ৮২৬।

এই সংখ্যাগুলি দেখতে অতি নিরীহ কিন্তু এ থেকে অনেক কিছু অনুমান করে নেওয়া চলে। ব্যারোমিটারে পারার ওঠানামার মধ্যে যেমন ঝড়ের পূর্বাভাস টের পাওয়া যায়—তেমনি যে-কোন গ্রহের ভর ও ব্যাস জানা থাকলে নির্ভুলভাবে অনুমান করে নেওয়া চলে সেই গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে কিনা। পৃথিবীতে কেন বায়ুমণ্ডল আছে আর চাঁদে কেন বায়ুমণ্ডল নেই—তা আমরা আগেই জেনেছি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে তার কারণ পৃথিবীর টানের জোর হাওয়া-কণার গতির জোরের চেয়ে বেশি। আমরা একথাও জানি যে হাওয়ার কণা সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দিতে পারলেই পৃথিবীর টানের জোর তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারত না। অর্থাৎ পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে কমপক্ষে সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুটতে হবে। প্রত্যেক গ্রহের ক্ষেত্রেই এমনি একটা বেগের মাপ আছে—যে মাপে পৌঁছতে পারলে সেই বিশেষ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে ফেলা যায়। এই মাপটার নাম দেওয়া যাক নিষ্ক্রমণ-বেগ। হিসেব করে দেখা গেছে, শুক্রগ্রহে নিষ্ক্রমণ-বেগের মাপ হচ্ছে সাড়ে-ছ-মাইল—পৃথিবীর চেয়ে মাত্র আধ মাইল কম। সুতরাং আশা করা যেতে পারে, শুক্রগ্রহের হাওয়া শুক্রগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে বাইরে যেতে পারেনি। অর্থাৎ শুক্রগ্রহের নিশ্চয়ই পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল আছে।

এখানে একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। কোন্ গ্রহের ওজন কত—তা নির্ভর করে ভরের উপরে। যদি বলা হয়, পৃথিবীর ভরকে একক ধরলে বুধগ্রহের ভর হচ্ছে ০·০৩৭ এবং শুক্রগ্রহের ভর ০·৮২৬—তাহলে এই দুটি গ্রহের ওজন সম্পর্কেও আমরা ধারণা করে নিতে পারি। পৃথিবীর ওজন হচ্ছে, ৬-এর পরে একুশটা শূন্য বসালে সংখ্যাটা যা দাঁড়ায় প্রায় ততো টন। এবার শুক্রগ্রহ ও বুধগ্রহের ওজন বার করাটা শুধু অঙ্ক কষার ব্যাপার।

আবার কোন গ্রহের ভর বা ওজন জানা থাকলেই সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানের মাপটা সরাসরি জানা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত

নেওয়া যাক। আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবীতে যে-লোক ছ-ফুট হাইজাম্প দিতে পারে, চাঁদে গিয়ে সে হাইজাম্প দেবে ছত্রিশ ফুট। অথচ আমরা জানি, পৃথিবীর ভর যদি হয় ১'০০, তাহলে চাঁদের ভর হবে ০'০১২৩; অর্থাৎ চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় আশি ভাগের একভাগ। তার মানে এই দাঁড়ায় যে পৃথিবীতে যে-লোক ছ-ফুট হাইজাম্প দেবে, চাঁদে গিয়ে সে ছ-এর আশি গুণ, অর্থাৎ চারশো-আশি ফুট হাইজাম্প দেবে। কিন্তু হিসেবটা অত সহজ নয়। যদি পৃথিবী ও চাঁদের ব্যাস সমান হত তাহলেই এই সহজ হিসেব চলত। কিন্তু আমরা জানি, পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। একথাও আমরা জানি, কোন বস্তুপিণ্ডের কেন্দ্র থেকে যতো দূরে যাওয়া যায়, সেই বস্তুপিণ্ডের টানের জোরও ততো কমতে থাকে। এইজন্যেই চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর ভর আশি গুণ হওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চেয়ে অনেক বেশি, সেজন্যে মাধ্যাকর্ষণের টানের বেলায় চাঁদের টানের চেয়ে পৃথিবীর টান বেশি হয় মাত্র ছ-গুণ।

তেমনি ভর বা ওজন জানা থাকলেই জানা যায় না কোন একটা গ্রহ মহাশূন্যের কতটা জায়গা জুড়ে আছে। সেজন্যে জানা চাই ঘনত্ব। যেমন, সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে ৩, ৩২, ১০০ গুণ বেশি। কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ৩, ৩২, ১০০ গুণের চেয়েও অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকে। তার কারণ সূর্যের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। জলের ঘনত্ব যদি হয় ১'০০, তাহলে পৃথিবীর ঘনত্ব ৫'৫২ এবং সূর্যের ঘনত্ব ১'৪১। অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্ব সূর্যের ঘনত্বের প্রায় সাড়ে-চার গুণ বেশি। আর হিসেব করে দেখা গেছে, মহাশূন্যে পৃথিবীর তুলনায় সূর্য তের লক্ষ গুণ বেশি জায়গা জুড়ে আছে। সূর্য কেন পৃথিবীর তুলনায় তের লক্ষ গুণ বেশি জায়গা জুড়ে থাকবে— সেই হিসেবটা এবার আমরাও বুঝে নিতে পারি। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে প্রায় সোয়া-তিন লক্ষ গুণ বেশি আর পৃথিবীর ঘনত্ব সূর্যের চেয়ে প্রায় সাড়ে-চার গুণ বেশি—এই সোয়া-তিন

লক্ষকে সাড়ে-চার দিয়ে গুণ করলে মোটামুটি তের লক্ষ সংখ্যাটি পাওয়া যায়। এই বইয়ের শেষদিকে একটি ছক কেটে সূর্য ও সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের ভর, ঘনত্ব, ব্যাস ইত্যাদি দেওয়া আছে। সংখ্যাগুলি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ বটে কিন্তু তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু তথ্য এইভাবে বার করে নেওয়া চলতে পারে।

এই সমস্ত অঙ্কের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়ে এবার দেখা যাক, শুক্রগ্রহের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পেরেছি কিনা।

শুক্রগ্রহের দিকে রওনা হবার আগে আমরা যদি এমন একটা সময় বেছে নিই যখন পৃথিবী ও সূর্য সবচেয়ে কাছাকাছি তাহলে আমরা সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাব। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ৫৮৪ দিন পরে পরে পৃথিবী আর শুক্র সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। তখন এই দুটি গ্রহের দূরত্ব হয় মাত্র দু-কোটি ষাট লক্ষ মাইল। আগেই বলেছি, আমাদের রকেট তৈরি হয়েছে দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিশক্তি আর অঙ্কের আঁকজোক দিয়ে। সুতরাং শুক্রগ্রহে রওনা হবার জন্যে আমরা সবচেয়ে কম দূরত্বের সময়টাই বেছে নেব।

কিন্তু এত কাছাকাছি আসা সত্ত্বেও শুক্রের আসল চেহারাটা আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। মেঘের বর্ম পরে শুক্র সব সময়ে নিজেকে আড়াল করে রাখে। আমাদের রকেটকেও এই মেঘ ছুঁয়েই ফিরে আসতে হবে। এত পুরু আর ঘন মেঘ আর সেই মেঘে এমন উত্তাল মাতামাতি যে আজ পর্যন্ত সেই মেঘ ফুটো করে ভিতরে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

কিন্তু শুক্রগ্রহের মেঘ দেখে আমাদের অবাক হতে হবে। সেই মেঘে জলের বাষ্প নেই—শুধু ধুলো। পৃথিবীর আকাশে নানা রঙের মেঘ আমরা দেখি। কখনো তা কালো অজগরের মতো ফুঁসে ওঠে—কখনো তা পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। কখনো অজস্র ধারায় নেমে আসে—কখনো বা সূর্যাস্তের আকাশে শুধু

খানিকটা রঙের সমারোহ সৃষ্টি করেই মিলিয়ে যায়। 'নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাই রে।' ঠাঁই শুক্রগ্রহেও নেই ; কিন্তু নবঘন নয়, বরং বলা যেতে পারে চিরঘন ; নীল নয়, হল্‌দে ; আর আষাঢ়-গগন কথাটা এখানে বাহুল্য মাত্র। অর্থাৎ, হল্‌দে ধুলোর মেঘে সারাটা বছর শুক্রগ্রহের আকাশ ঠাসা থাকে। এইটুকু দেখেই আমাদের রকেট ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ধুলোর মেঘের অন্তরালে কী আছে তা কল্পনা করা চলে মাত্র।

আমাদের রকেটের যাতায়াতের পথে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে। শুক্রগ্রহে ধুলোর মেঘের ওপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস। পৃথিবীর হাওয়ার প্রধান উপাদান হচ্ছে অক্‌সিজেন গ্যাস—কিন্তু শুক্রগ্রহের হাওয়ায় অক্‌সিজেন গ্যাস একেবারেই নেই। পৃথিবীর হাওয়ায় অক্‌সিজেন ছাড়াও জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে আছে—শুক্রগ্রহের হাওয়ায় জলীয় বাষ্প একেবারেই নেই। শুধু আছে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস—যা নাকি আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

এবার কয়েকটি অনুমান করা চলে। যেখানে ধুলোর মেঘের উপরেও শুধু কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস, সেখানে ধুলোর মেঘের নিচেও এই গ্যাস ছাড়া আর কিছু নেই। কার্বন ডাই-অক্‌সাইড হচ্ছে অন্যতম ভারী গ্যাস এবং ভারী গ্যাস সাধারণতঃ নিচের দিকে থাকে, হাল্‌কা গ্যাস উপরের দিকে উঠে যায়—সুতরাং ধুলোর মেঘের উপরের রাজ্যেও যেখানে এই ভারী গ্যাসের অধিষ্ঠান সেখানে নিম্নতর দেশে অপেক্ষাকৃত হালকা গ্যাসগুলির স্থান কিছুতেই হতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা, শুক্রগ্রহে জলের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। পৃথিবীর হাওয়ায় যে এত প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প আছে তার কারণ পৃথিবীর জল। সমুদ্রঘেরা এই পৃথিবীতে জলের যোগান অসংখ্য ধারাপথে। পাহাড়ী ঝরনা থেকে খরস্রোতা নদী পর্যন্ত বিচিত্র তার রূপ। আর সেই জল সূর্যের তাপে অনবরত বাষ্প হয়ে আকাশে

ওঠে। সেই বাষ্পের পুঞ্জীভবনকেই আমরা বিভিন্ন ঋতুর আকাশে বিভিন্ন রূপে দেখি। আর সেই বাষ্পের কণা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে সারা আকাশে ছড়িয়ে থাকে। শুক্রগ্রহের হাওয়ায় সূক্ষ্মতম যন্ত্র দিয়েও বাষ্পের একটি কণাকেও ধরা যায়নি। সুতরাং অবধারিত সিদ্ধান্ত—শুক্রগ্রহে এক ফোঁটাও জল নেই।

পৃথিবীতে অক্‌সিজেন গ্যাস তৈরির কারখানা হচ্ছে উদ্ভিদ-জগৎ। গাছের সবুজ পাতাগুলো হচ্ছে এক-একটি ক্ষুদে রাক্ষসবিশেষ। বায়ুমণ্ডলের ভাঁড়ারে যেখানে যতো কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস জমা হয় তা এই ক্ষুদে রাক্ষসগুলো রাত্রির অন্ধকারে চুপিচুপি গ্রাস করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবটুকু গ্রাস করবার ক্ষমতা গাছের পাতার নেই ; কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাসের শুধু কার্বনের অংশটুকু আত্মসাৎ করে আর সূর্যের আলো ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অকসিজেনের অংশকে আবার ফিরিয়ে দিতে হয় বায়ুমণ্ডলের ভাঁড়ারে। পৃথিবীর হাওয়ায় যে অক্‌সিজেনের যোগান অব্যাহত থাকতে পারছে তা সম্ভব হয়েছে গাছপালার জন্যেই। এ থেকে এ-সিদ্ধান্ত অবশ্য করা চলে না যে যে-কোন গ্রহের হাওয়ায় অক্‌সিজেন থাকার অর্থই হচ্ছে সেই গ্রহে গাছপালা থাকা। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা চলে যে কোন গ্রহের হাওয়ায় যদি শুধু কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস ছাড়া আর কিছু না থাকে—তবে সেই গ্রহে কোনক্রমেই গাছপালা নেই। সুতরাং শুক্রগ্রহে 'তৃণে-পুলকিত' মাটি পাওয়া যাবে না—শুধু 'ধূ ধূ মরু-বালিয়াড়ি'।

সুতরাং আমাদের রকেট ফিরে আসুক। ইতিমধ্যে শুক্রগ্রহের একটা মোটামুটি ছবি এঁকে নিতে আমরা চেষ্টা করি।

শুক্র হচ্ছে এক মরুভূমির দেশ। সেখানে সমুদ্র নেই, হ্রদ নেই, নদী নেই, ঝরনা নেই। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। উত্তাপ অসহ্য রকমের তীব্র, সূর্যের থেকে এতটা দূরে কোন গ্রহে যে-উত্তাপ আশা করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি। ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা আর সাইক্লোন কল্পনাতীত সংহারমূর্তি ধারণ করে সেই মরুভূমির দেশে ফুঁসে ফুঁসে

উঠছে। আর সেই ঝড়ের তাড়নায় শুক্রগ্রহে যে ধুলোর মেঘ ওঠে তার চেহারা পৃথিবীর মরুদেশে ধুলোর ঝড় দেখে কল্পনা করা যাবে না। সেই ধুলোর মেঘ শুক্রগ্রহকে দুর্ভেদ্য এক আবরণে ঢেকে রেখেছে। বাতাস আছে বটে কিন্তু পৃথিবীর মতো বাতাস নয়—সে-বাতাসের সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে তৈরি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর চেহারাও ঠিক এমনি ছিল। এমনি ধুলোর ঝড়, এমনি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। তারপর একসময় এই পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবির্ভাব। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কার্বনের ভাগটুকু আত্মসাৎ করে উদ্ভিদজগৎ বেড়ে ওঠে। সেই সঞ্চয়ের ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীর মাটির স্তরে স্তরে—কয়লাখনির গর্ভে। আর উদ্ভিদজগতের সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসের যোগান চলতে থাকে। তারপর একদিন অনুকূল আবহাওয়ায় সৃষ্টি হয় প্রাণীজগৎ। এই আশ্চর্য বিবর্তনের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আছে শুক্রগ্রহ।
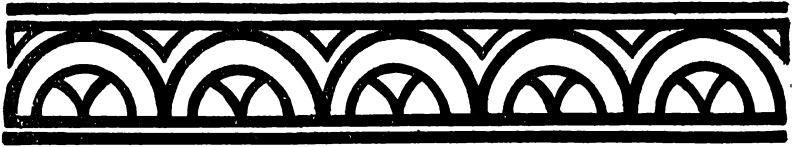
সবচেয়ে কাছের

একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপজ্বালা,—
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা।

এবার আমাদের যাত্রা বুধগ্রহের দিকে। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। আর সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট গ্রহ।

আমাদের রকেট এগিয়ে চলুক। সেই অবসরে বুধগ্রহ সম্পর্কে আমরা কিছু খবর সংগ্রহ করে নিই।

বুধগ্রহের ব্যাস হচ্ছে ৩,০০৮ মাইল। সূর্য থেকে এই গ্রহটির মোটামুটি দূরত্ব ৩,৬০,০০,০০০ মাইল। বাড়তির দিকে এই দূরত্ব গিয়ে পৌঁছয় ৪,৩৫,০০,০০০ মাইলে আর কমতির দিকে নেমে আসে ২,৮৫,০০,০০০ মাইলে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময় বুধগ্রহ থেকে সূর্যের দূরত্ব দেড়কোটি মাইল বাড়ে-কমে। বুধ গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি তখন তার গতি সেকেণ্ডে ছত্রিশ মাইল আর যখন সবচেয়ে দূরে তখন তার গতি সেকেণ্ডে চব্বিশ মাইল।

জলের ঘনত্বকে যদি একক ধরা যায় তাহলে বুধগ্রহের ঘনত্ব হচ্ছে ৩'৭৩। আর পৃথিবীর ভর যদি হয় ১'০০, তাহলে বুধগ্রহের ভর ০'০৩৭। এই সংখ্যাগুলি যদি জানা থাকে তাহলে বুধগ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু খবর আমরা আগে থেকেই জেনে নিতে পারি।

আকারের দিক থেকে যদি তুলনা করা যায় তাহলে বুধগ্রহ হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর আকারকে যদি ধরা যায় ১০০, তাহলে বুধগ্রহের আকার হবে ৩৮। আর যদি ঘনত্ব ও ভরের কথা মনে রাখা যায়, তাহলে বলা চলে, মহাশূন্যে পৃথিবী

যতোটা জায়গা জুড়ে আছে তার মধ্যে প্রায় ষোলটা বুধগ্রহকে পুরে রাখা চলে।

এবার মাধ্যাকর্ষণের টানের কথায় আসা চলে। সোজা হিসেবে মনে হতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান বুধগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানের চেয়ে ষোলগুণ বেশি। কিন্তু যেহেতু বুধগ্রহের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট—সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের টানও সেই অনুপাতে বাড়ে। হিসেব করে দেখা গেছে, বুধগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ২·৪ মাইল।

সূর্যের চারদিকে একবার পাক দিয়ে আসতে বুধগ্রহের সময় লাগে ৮৮ দিন। চাঁদের অর্ধাংশের সঙ্গে পৃথিবীর যে-ধরনের আড়ি—তেমনি বুধগ্রহের অর্ধাংশ সূর্যের দিক থেকে সারা বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে। অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে বুধগ্রহের যে সময় লাগে, নিজের চারদিকে একবার দরবেশী নাচের পাক খেতেও লাগে হুবহু সেই একই সময়। ফলে বুধগ্রহের এক অংশে চির দিন, অপর অংশে চির রাত্রি।

আমাদের রকেট এগিয়ে চলুক, ততোক্ষণ বরং এই মুখ-না-দেখাদেখির ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই মুখ-না-দেখাদেখির ব্যাপারটা কিন্তু চলে খুব-বড়ো আর খুব-ছোটর মধ্যে, সমান-সমানের মধ্যে নয়। মুখ-না-দেখাদেখি না বলে বরং বলা উচিত একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। তাও বড়ো-র বেলায় নয়, শুধু ছোট-র বেলায়। রাজার সিংহাসনের কাছে আসতে হলে কুর্নিশ করতে হয়; মুখ ফিরিয়ে ছুট দেওয়াটা সেখানে বেয়াদপি। মহাকাশেও তেমনি খুব-ছোট কুর্নিশ করে চলে খুব-বড়োকে, মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারে না। সেই দরবেশী নাচের উপমাটা দিয়ে বলা চলে যে বড়োদের দরবেশী নাচের আসরে ছোটদের দরবেশী নাচ এক ঘুরনে এক পাক মাত্র।

সুতরাং বুঝতে হবে, কোথাও নিশ্চয়ই কড়া রকমের শাসন আছে। সেটা কী? পৃথিবী ও চাঁদের দৃষ্টান্ত নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা

করা যাক। এমন একটা সময় ছিল যখন চাঁদের শরীরে আজকের দিনের মতো কাঠিন্য আসেনি। উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে কাদার মতো অবস্থায় পৌঁছতেও লক্ষ লক্ষ বছর সময় লেগেছিল চাঁদের। কল্পনা করা যাক, সেই সময়ে চাঁদের দরবেশী নাচের পাক পুরোদমে চলেছে। কিন্তু সেই খুব-ছোট চাঁদের খুব কাছাকাছি রয়ে গেছে খুব-বড়ো পৃথিবী আর সেই খুব-বড়ো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ খুব-ছোট চাঁদকে অনবরত টান মারছে। চাঁদের শরীর তখনো একেবারে কঠিন হয়নি, সুতরাং ব্যাপারটা যা ঘটবে তা হচ্ছে এই ঃ ঘূর্ণ্যমান চাঁদের যখন যেদিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকবে, সেদিকটা ফুলে উঠবে ঠিক একটা ফোড়ার মতো। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর সমুদ্র যেমন ফেঁপে ওঠে—এ-ব্যাপারটাও ঠিক তাই। অথচ চাঁদের দরবেশী নাচের পাক যদি পুরোদমে চলতে থাকে তাহলে এই ফোড়াটাও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। চাঁদ যেদিকে পাক খাচ্ছে, ফোড়াটা চলতে শুরু করবে ঠিক তার উল্‌টো দিকে। অর্থাৎ চাঁদ যতো চরকিপাকই খাক না কেন, ফোড়ার মুখটা থাকবে সেই একই দিকে—পৃথিবীর দিকে। এবার তাহলে ব্যাপারটা কল্পনা করা যাক। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, আবার নিজের চারদিকে দরবেশী নাচের মতো বা লাট্টুর মতো চরকিপাক খাচ্ছে। এই দু-ধরনের পাক খাওয়ার মোট ফল হিসেবে চাঁদের যেদিকটা যখন পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে—সেদিকটা ফোড়ার মতো ফুলে ওঠে। চাঁদের চরকিপাক যতো দ্রুত হয় এই ফোড়াও ততো দ্রুত সরতে থাকে যাতে ফোড়ার মুখটা সব সময়েই থাকতে পারে পৃথিবীর দিকে। এই চলমান ফোড়াটাই চাঁদের চরকিপাকের ক্ষেত্রে কাজ করে একটা ব্রেক হিসেবে। ফলে খুব আস্তে আস্তে চাঁদের চরকিপাক স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। এইভাবে কাটে কয়েক লক্ষ বছর। শেষকালে দেখা যায়, চাঁদের চরকিপাক স্তিমিত হতে হতে এমনভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের বিশেষ

একটা দিকই বরাবর পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। অর্থাৎ সেই ফোড়াটাকে আর চলেফিরে বেড়াতে হয় না। এই অবস্থায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের দরবেশী নাচের চরকিপাকও ঘটে ঠিক একবার। মনে হতে পারে সারা বছর ধরে চাঁদ যখন যেখানেই থাকুক না কেন, পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকে পৃথিবীকে কুর্নিশ করে চলেছে। সূর্যের দিক থেকে পৃথিবী ও চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হতে পারে, একটা ফুটবল ও একটা পিঙপঙের বল নেহাতই খামখেয়ালির মতো লাফালাফি করছে। আসলে কিন্তু তা নয়। মহাকাশে খামখেয়ালিপনার স্থান নেই। আপাতবিচারে যেটাকে মনে হয় খামখেয়ালিপনা—তা আসলে অনেকগুলো টান আর অনেকগুলো ছুটের অত্যন্ত বাস্তব যোগফল। সূর্যের দিক থেকে তাকিয়ে দেখলে পৃথিবী ও চাঁদের লাফালাফি কেমন দেখাবে তার একটা ছবি নিচে দেওয়া হল।
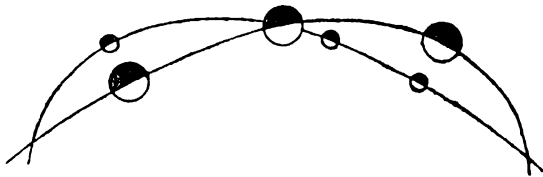
খুব-বড়ো আর খুব-ছোটর মধ্যে টানাটানির ফল কি হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত যদি হয় পৃথিবী ও চাঁদ—তাহলে অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূর্য ও বুধগ্রহ। আরো অন্তত ত্রিশটি দৃষ্টান্ত আমাদের এই সৌর-মণ্ডলেই আছে। মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ, বৃহস্পতির বারোটি, শনির নটি, ইউরেনাসের পাঁচটি এবং নেপচুনের দুটি—এই ত্রিশটি উপগ্রহের প্রত্যেকটিই স্ব-স্ব গ্রহের চারদিকে একবার ঘুরপাকের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারদিকে একবার চরকিপাক খায়। অর্থাৎ স্ব-স্ব গ্রহের

দিকে সব সময়ে একই দিক ফিরিয়ে থাকে। সূর্যের টানে বুধগ্রহেরও দরবেশী নাচের চরকিপাক স্তিমিত হতে হতে দাঁড়িয়েছে বছরে একবারে। বছর মানে বুধগ্রহের বছর—পৃথিবীর হিসেবে ৮৮ দিন। অর্থাৎ বুধগ্রহের এক অংশে সূর্যাস্ত নেই—অপর অংশে সূর্যোদয় নেই। আর এই দুই অংশের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সূর্যকে দেখা যাবে দিগন্তরেখার কাছে। দুষ্টু ছেলের মতো এক-একবার ডুব দিচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অনেকটা লুকোচুরি খেলার মতো। কুর্নিশ করে চলার যে উপমাটা দিয়েছি সেটা নেহাতই একটা উপমা নয়। বুধগ্রহের সূর্য-পরিক্রমা বা চাঁদের পৃথিবী-পরিক্রমা সত্যি সত্যিই অনেকটা কুর্নিশ করে চলার মতো। মাঝে মাঝে তারা মাথা নোয়ায়। বুধগ্রহের চলার এই বিশেষ ভঙ্গির জন্যেই বুধগ্রহের কোন কোন জায়গা থেকে সূর্যকে অনবরত লুকোচুরি খেলতে দেখা যায়।

আগেই বলেছি, বুধগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে ২'৪ মাইল। আড়াই মাইলেরও কম। আমরা আগেই জেনেছি যে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে সাত মাইল, চাঁদ থেকে সেকেণ্ডে দেড় মাইল, শুক্রগ্রহ থেকে সেকেণ্ডে সাড়ে-ছ' মাইল। পৃথিবী ও শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে, চাঁদে নেই—এবং খুব সম্ভবতঃ বুধগ্রহেও নেই। খুব সম্ভবতঃ বললাম এইজন্যে যে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, বুধগ্রহে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের খুব পাতলা একটা স্তর থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তা থাকার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ বুধগ্রহ এককালে যখন খুবই উত্তপ্ত ছিল তখন বায়ুমণ্ডলের শেষ কণাটি পর্যন্ত মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে। যে গ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে মাত্র ২'৪ মাইল সেখানে বায়ুকণারা অতি সহজেই মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুক্রগ্রহ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পরেও যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোথাও কোন গ্যাস তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তার সবটাই হয়তো মহাশূন্যে উধাও না হয়েও যেতে পারে। তবে যেটুকু থেকে যাবে তা এত অকিঞ্চিৎকর যে পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরালো যন্ত্র দিয়ে

তৈরি ভ্যাকুয়ামেও তার চেয়ে বেশি বায়ুকণা থাকে। পৃথিবী থেকে যতো রকম ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব তা করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাননি।

এবারে আমাদের রকেটের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা যাক।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে বুধগ্রহকে খালি চোখে খুব অল্প সময়েই দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যাস্তের পরে বা সূর্যোদয়ের আগে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে এই গ্রহটিকে দেখা যেতে পারে। তাও খালি চোখে নয়। মহাবিজ্ঞানী কোপারনিকাস ত্রিশ বছর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেও বুধগ্রহের অস্তিত্ব টের পাননি।

সুতরাং আমাদের কল্পনার রকেটে চেপেও বুধগ্রহকে খুব ভালোভাবে দেখে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে যেটুকু দেখা যাবে তার উপরে নির্ভর করেই বুধগ্রহের একটা মোটামুটি ছবি আঁকার চেষ্টা করা যাক।

বুধগ্রহের একদিকে চিরকাল দিন, অপরদিকে চিরকাল রাত্রি। চিরদিনের দেশে উত্তাপ ৪০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। জলের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক ; সীসে, এমন কি দস্তা পর্যন্ত, এই উত্তাপে গলে গিয়ে ফুটতে শুরু করে। আর চিররাত্রির দেশে তেমনি ঠাণ্ডা, যতোটা ঠাণ্ডা হলে জল জমে বরফ হয় তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি ঠাণ্ডা। এবং এই চিরদিন ও চিররাত্রির দেশের মাঝামাঝি জায়গায় উত্তাপও মাঝামাঝি এবং তা দ্রুত বাড়ে-কমে। বুধগ্রহের মাটি খুব সম্ভবতঃ চাঁদের মাটির মতোই—আগ্নেয়গিরির ভস্মাবশেষ। আর খুব সম্ভবতঃ বুধগ্রহে এখনো জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিও আছে। সেই সব আগ্নেয়গিরি থেকে এখনো মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক ও ধোঁয়া উঠে বুধগ্রহের আকাশে অনেক উঁচু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভবতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের খুব পাতলা একটি বায়ুমণ্ডলও বুধগ্রহকে জড়িয়ে আছে। কোথাও জল বা বাষ্পকণা নেই, অক্সিজেন নেই, কোন রকম হাল্কা গ্যাসের চিহ্নমাত্র নেই।

এবার তাহলে যাত্রা শুরু করা যাক সূর্যের দিকে।

ভীষণতম—সুন্দরতম

বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া—সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই

বুধগ্রহ থেকে যাত্রা শুরু করবার সময়েই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যতো বড়ো দেখায়—বুধগ্রহ থেকে সূর্যকে তার চেয়ে সাতগুণ বড়ো দেখাচ্ছে। আমাদের রকেট যতো এগিয়ে চলবে—সূর্য ততো বড়ো হবে। শেষকালে বড়ো হতে হতে এক সময়ে সারা আকাশ জুড়ে সূর্য ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

কল্পনা করা যাক আমাদের রকেট এমন এক জায়গায় এসে পৌঁচেছে যেখানে সারা আকাশ জুড়ে শুধু সূর্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে সূর্যের বিপুল চাঞ্চল্য। সমস্ত সূর্যলোকের বস্তুপিণ্ড যেন টগবগ করে ফুটছে, ফুঁসে ফুঁসে উঠছে, ছড়িয়ে ছিট্‌কিয়ে পড়ছে। আসলে সূর্যটা হচ্ছে মস্ত একটা পাওয়ার-স্টেশনের মতো। যে পরিমাণ তেজ সেই পাওয়ার-স্টেশনে প্রতি মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন কিছু এই পৃথিবীতে নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিলে সূর্যের তেজের প্রচণ্ডতা সম্পর্কে হয়তো ধারণা হতে পারে। একটা পয়সার আয়তন যতোখানি ততোখানি বস্তু যদি সূর্যের বস্তুপিণ্ড থেকে তুলে এনে নাগপুরের কাছাকাছি কোন জায়গায় রাখা যায়—তাহলে সেই পয়সা-পরিমাণ সূর্যের তেজে সারা ভারত

শ্মশানে পরিণত হবে, একটি প্রাণীও জীবিত থাকবে না। সুতরাং গোটা সূর্যের তেজ যে কী ভয়ংকর আর কী ভীষণ তা শুধু কল্পনা করা চলে। আর এই ভয়ংকর-ভীষণ তেজ সূর্যকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে চলেছে। এই আলোড়নেরও কোন তুলনা এই পৃথিবীতে নেই। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা উথলিয়ে ওঠে, ঘূর্ণিহাওয়ায় ধুলোর ঝড় পাক খায়—কোন কিছুর সঙ্গে এই আলোড়নের তুলনা চলে না। মুহূর্তে মুহূর্তে ভিতরের বস্তুপুঞ্জ অস্থিরভাবে উপরে উঠে আসছে, গড়াচ্ছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে জলস্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে উঠছে সেই বস্তুপুঞ্জ। তাকিয়ে দেখে তার অন্ত পাওয়া যায় না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে তার ব্যাপ্তি। আর তখন সেই লাল টকটকে আগুনের স্তম্ভ থেকে ঝরে পড়ে লক্ষ লক্ষ ফোয়ারা, কোটি কোটি ফুলকি। আর শুধু কি স্তম্ভ? মাঝে মাঝে মনে হবে যেন অতিকায় একটা জানোয়ার হিংস্র থাবা তুলে সূর্যের উপর দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে। সেই জানোয়ার যখন হাঁ করে তখন বোঝা যায় গোটা পৃথিবীকে সে একটা বড়ির মতো টপ্ করে গিলে ফেলতে পারে। ১৯১৯ সালের সূর্য-গ্রহণের সময় এমনি এক অতিকায় জন্তুকে মাথা তুলতে দেখা গিয়েছিল। নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সেই জন্তুটির মাপ ছিল সাড়ে তিন লক্ষ মাইল। আস্তে আস্তে সেই জন্তুটি মাথা তুলে তাকায়, লেজ তুলে ধরে, তারপর লাফ মারে মহাশূন্যে। সূর্যাস্ত হবার আগে পর্যন্ত জন্তুটিকে প্রায় পাঁচ লক্ষ মাইল উঠে আসতে দেখা গিয়েছিল। এমনি প্রায়ই হয়। মস্ত এক-একটা পিণ্ড বিচিত্র আকার নিয়ে এবং অনবরত আকার পাল্টাতে পাল্টাতে সূর্যের গা থেকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে লাফ মারে আর এক-এক লাফে হাজার হাজার মাইল দূরে ছিট্‌কিয়ে আসে।

আমাদের রকেট আরো এগিয়ে আসুক। এবার দেখা যাচ্ছে, দূর থেকে যেগুলোকে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ বলে মনে

হচ্ছিল—আসলে সেগুলো দাগ নয়, মস্ত এক-একটা গহ্বর। এক-একটা গহ্বর এত বড়ো যে গোটা পৃথিবীকে তার মধ্যে পুরে রাখা চলে।

এবার আমরা তৈরি হয়েছি প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষের জন্যে। আমাদের রকেট সূর্যের টানে নক্ষত্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। এবার নিশ্চয়ই সূর্যের গায়ে আছড়ে পড়বে। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যাবার পরেও কিন্তু আমরা টের পাই—তবুও আমাদের রকেট ছুটে চলেছে, আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি—চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন। আগুনের ফুলঝুরি, আগুনের ফোয়ারা, আগুনের নদী, আগুনের সমুদ্র। ফুলের মতো, বৃষ্টির মতো, তুষারের মতো—শুধু আগুন আর আগুন। অতি ভীষণ, অতি সুন্দর।

আমরা আছি আমাদের রকেটের নিরাপদ আশ্রয়ে। এই নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে বাইরের আগুনের খানিকটা নমুনা নিয়ে আসা যাক। আগুনের এই নমুনাটুকুকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে, আমাদের এই পৃথিবী যে-সব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সবকটিই এই আগুনের মধ্যে আছে। শুধু হাল্‌কা ধরনের গ্যাসগুলি নয়, প্লাটিনাম-রূপো সীসে ইত্যাদি ভারী ধাতুগুলোও। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে কোন কিছুই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। সমস্তই আছে গ্যাসীয় অবস্থায় আর সেইজন্যেই আমাদের রকেট কোন বস্তুতে ধাক্কা না খেয়ে সূর্যকে ফুঁড়ে ভিতরে চলে এসেছে। পৃথিবীতে যখন কোন কিছু নেমে আসে তখন প্রথমে তাকে আসতে হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে, তারপর ধাক্কা খেতে হয় পৃথিবীর মাটিতে। কিন্তু সূর্যলোকে এসে প্রথম দেখা যাবে সূর্যের বায়ুমণ্ডল বলে আলাদা কিছু নেই—মূল সূর্যটাই পাতলা হতে হতে সূর্যের বায়ুমণ্ডল তৈরি করেছে। এ দুয়ের মধ্যে কোথাও স্পষ্ট কোন সীমারেখা নেই।

আমাদের সঙ্গে যদি থার্মোমিটার থাকে তাহলে দেখা যাবে, যতোই আমাদের রকেট সূর্যের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাবে ততোই

থার্মোমিটারের পারা উঁচুতে উঠছে। শেষকালে সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুতে থার্মোমিটারের পারা উঠবে চার কোটি ডিগ্রির কাছাকাছি। এই পৃথিবীতে বসে এই প্রচণ্ড উত্তাপ সম্পর্কে কোন ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। শুধু উদ্দাম কল্পনার রাশ ছেড়ে দেওয়া চলে।
সূর্যের কেন্দ্রে উত্তাপ ছাড়াও আছে প্রচণ্ড একটা চাপ। আমরা জানি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে-সাত সের। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের বয়লারে বাষ্পের যে চাপ তৈরি হয় তা বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় কুড়িগুণ। কিন্তু সূর্যের কেন্দ্রে সূর্যের বস্তুপিণ্ডের যে চাপ পড়ে তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের চারহাজার কোটি গুণ। এই প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রচণ্ড চাপের মোট ফলটা কী হতে পারে—তা একবার কল্পনা করা যাক। আমরা জানি, উত্তাপের ফলে বস্তুর আয়তন বাড়ে, চাপ দিলে বস্তুর আয়তন কমে। সূর্যের কেন্দ্রে চারকোটি ডিগ্রি উত্তাপের সঙ্গে চারহাজার-কোটি চাপের টানাটানি চলেছে। একটি চায় আয়তনকে বাড়াতে, অপরটি চায় কমাতে। ফলে সূর্যের বস্তুপুঞ্জ খুববেশি বাড়তেও পারে না, খুববেশি কমতেও পারে না। কিন্তু এই টানাটানির ফলে অন্য যে ব্যাপারটি ঘটে তা অতি ভয়ংকর।
এই ভয়ংকর ব্যাপারটিকে বুঝতে হলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। খুব সংক্ষেপে বলছি। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি ভারী কেন্দ্রবিন্দু—তার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভরের উপরেই পরমাণুর ভর নির্ভর করে; বা অন্য কথায়, পরমাণুর ভরের সবটাই পুঞ্জীভূত থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে দু-ধরনের মৌলিক কণা—প্রোটোন ও নিউট্রন। বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক দিয়ে প্রোটোন পজিটিভ, নিউট্রন নিরপেক্ষ। আর এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সূর্যের চারদিকে গ্রহের মতো কক্ষপথে ঘুরপাক খায় নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকট্রন-কণা। ইলেকট্রন-কণারা বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে নেগেটিভ। স্বাভাবিক অবস্থায় নিউক্লিয়াসের পজিটিভ বিদ্যুৎ ইলেকট্রন-কণাদের নেগেটিভ বিদ্যুতের সঙ্গে কাটাকুটি

হয়ে যায়, হাতে কিছুই থাকে না। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুরা হয় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। প্রোটোনের সঙ্গে নিউট্রনের এবং নিউক্লিয়াসের সঙ্গে অন্তত কয়েকটি ইলেকট্রন-কণার এমন একটা বজ্র-আঁটুনি থাকে যে সহজে তাদের বিশ্লিষ্ট করা যায় না। কিন্তু বাইরের দিকের কক্ষপথের কয়েকটি ইলেকট্রনকে অনায়াসেই টেনে বার করে নেওয়া যায়। হিসেব করে দেখা গেছে—প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণ তেজ নিহিত আছে ; কোন রকমে যদি পরমাণুর এই বজ্র-আঁটুনিকে ছিঁড়ে ফেলা যায় তাহলেই এই তেজ নিঃসরিত হয়ে পড়ে। এই তেজ আসে কোথা থেকে ? মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন যে বস্তুপুঞ্জই তেজে রূপান্তরিত হয়। তেজ ও বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক আছে। পরমাণু-বোমার যে তেজ—তার উৎস হচ্ছে এই। আর সূর্যের অন্তর্দেশের প্রচণ্ড তাপ ও চাপ শেষ পর্যন্ত পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে—ফলে সৃষ্টি হয় অপরিমিত তেজ আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে পরমাণুর রূপান্তর ; সূর্য প্রতি মুহূর্তে নিজের বস্তুর সঞ্চয়কে ক্ষয় করে করে তেজ বিকীরণ করছে। বা কল্পনা করা চলতে পারে, সূর্যের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন সূত্রের সাহায্যে হিসেব করে দেখিয়েছেন—কি-মাপে পরমাণুর অন্তর্নিহিত তেজের নিঃসরণ হঁতে পারে।

সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুকে অতিক্রম করে আমাদের রকেট এগিয়ে চলুক। কিন্তু এবারে আমাদের লক্ষ্য কী হবে ? যদি আমাদের রকেটের গতিমুখ পরিবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে, আশা করা যেতে পারে, আবার আমরা একসময়ে সূর্যলোকের বাইরে চলে আসব, তারপর যথাক্রমে আবার বুধ, শুক্র ও পৃথিবী। প্রায় সেই একই পথ। সুতরাং সূর্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে রওনা হবার সময়েই আমাদের রকেটের গতিমুখ পরিবর্তিত করা যাক। এবার আর দূরত্বকে অতিক্রম করা নয়, অতিক্রম করা সময়কে। আমাদের রকেট সময়কে অতিক্রম করে চলুক। সামনের দিকে নয়, পিছনের দিকে।

কল্পনা করা যাক, আমাদের রকেট সময়কে অতিক্রম করে চলতে চলতে আজ থেকে তিনশো কোটি বছর আগেকার কালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সৃষ্টির আদিতে

সেই তিনশো কোটি বছর আগেও সূর্য হুবহু এখনকার মতোই। হয়তো-বা আরেকটু উজ্জ্বল, হয়তো-বা আরেকটু বড়ো। সূর্যের জীবনকালে তিনশো কোটি বছর কিছুই নয়; আমাদের জীবনের একটা দিনের মতো। মাত্র একটি দিনে আমাদের শরীরের কতটুকু ক্ষয় হয়? কতটুকু আমরা বুড়িয়ে যাই? তেমনি তিনশো কোটি বছর আগেও সূর্যলোকের বস্তু ও উত্তাপের সঞ্চয় প্রায় আজকের মতোই ছিল—তিনশো কোটি বছরে যেটুকু কমেছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

কালের মাপ বোঝাতে গিয়ে আমরা 'বছর' শব্দটি ব্যবহার করছি বটে কিন্তু আসলে তখন বছর বলে কোন কিছু নেই। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে তাকে আমরা বলি বছর। কিন্তু তিনশো কোটি বছর আগে পৃথিবীরই অস্তিত্ব ছিল না। শুধু পৃথিবী কেন, সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহেরই অস্তিত্ব নেই। শুধু দেখা যাচ্ছে মস্ত একটা সূর্যকে। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে আকাশকে নতুন বলে মনে হবে। তিনশো কোটি বছরের মধ্যে নক্ষত্রের বিন্যাসে যথেষ্ট অদলবদল হয়েছে।

তবে নক্ষত্রের বিন্যাসে যতোই অদলবদল ঘটুক, একটা বিষয়ে কিন্তু এই তিনশো কোটি বছরের এপারে-ওপারে যথেষ্ট মিল আছে। আজকের আকাশে লুব্ধক নক্ষত্রকে যতোটা উজ্জ্বল দেখায়, তেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র সেই তিনশো কোটি বছর আগেও আর ছিল না।

তারপর একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মনে হয়, একটি নক্ষত্র যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। ক্রমে লুব্ধকের চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই বিশেষ নক্ষত্রটি। শেষকালে স্পষ্ট

বুঝতে পারা যায়, নক্ষত্রটি সূর্যের দিকেই ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে আকাশের গায়ে নক্ষত্রটি একটি থালার মতো বড়ো হয়ে ওঠে।

চাঁদের টানে যেমন পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার আসে তেমনি এই নক্ষত্রটি জোয়ার জাগায় সূর্যলোকের বস্তুপুঞ্জে। চাঁদের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড়ো এই নক্ষত্র সুতরাং তার টানটাও লক্ষ লক্ষ গুণ জোরালো। সেই প্রচণ্ড টানে সূর্যের যেদিকে সেই নক্ষত্রটি আছে সেদিকে সূর্যের বস্তুপুঞ্জ পর্বতের মতো উঁচু হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মাইল উঁচু সেই পর্বত। আর এই বিপুল পর্বত নক্ষত্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের গায়ের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে। নক্ষত্রটি যতো এগিয়ে আসে এই পর্বতও ততো উঁচু হয়ে ওঠে। তারপরেও যখন নক্ষত্রটি এগিয়ে আসে, সেই বিরাট পর্বত সূর্যের গা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। নক্ষত্রটি যদি আরো এগিয়ে আসত তাহলে এই ছিঁড়ে-যাওয়া বস্তুপুঞ্জ হয়তো সূর্য ও নক্ষত্রকে ডাম্বেলের মতো জোড়া লাগিয়ে দিতে পারত। কিন্তু নক্ষত্রটি আর এগিয়ে আসেনি, নিজের কক্ষপথে আবার দূরে চলে গেছে।

এবারে দেখা যাক, সূর্যের গা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া এই হাজার হাজার মাইল লম্বা পর্বতটির অবস্থান কী হবে? প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার যে সেই বস্তুপুঞ্জের চেহারা ঠিক পর্বতের মতো আর নেই। পর্বতটি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সময় আরো একরাশ বস্তুপুঞ্জকে স্রোতের টানের মতো টেনে নিয়ে এসেছে এবং সূর্যের গা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পর সেই বস্তুপুঞ্জের চেহারা হয়েছে ঠিক একটা চুরুটের মতো—ছুই প্রান্ত সরু, মাঝখানটা মোটা। সূর্যের চেয়ে সবচেয়ে দূরের প্রান্তটা হচ্ছে পর্বতের চুড়ো, মোটা মাঝখানটা গড়ে উঠেছে যখন নক্ষত্রের টান ছিল সবচেয়ে বেশি, আর সবচেয়ে কাছের সরু প্রান্তটা তৈরি হয়েছে যখন স্রোতের টান হয়ে গেছে স্তিমিত।

এবার দেখা যাক এই চুরুটটার অবস্থা কী হবে।

চুরুট বলছি বটে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মাইল লম্বা সেই অতিকায় চুরুটের আকার সম্পর্কে একটা ধারণা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তারপর আস্তে আস্তে সেই চুরুট ঠাণ্ডা হতে থাকে। ঠিক যেমন একতাল বাষ্প জমে গিয়ে কয়েক ফোঁটা জল হয়, তেমনি এই অতিকায় চুরুটটাও ঠাণ্ডা হতে হতে জমে গিয়ে সৃষ্টি করে কয়েকটি জমানো ফোঁটা। ফোঁটা বললাম বটে কিন্তু জলের ফোঁটার মতো অকিঞ্চিৎকর নয়। যেমন অতিকায় চুরুট, তেমনি অতিকায় ফোঁটা। সবচেয়ে ছোট ফোঁটাটির ব্যাসও অন্তত তিন হাজার মাইল। তবে সহজ বুদ্ধিতেই আশা করা চলতে পারে যে চুরুটের পেটমোটা মাঝখানটায় যে ফোঁটাগুলো হবে সেগুলো হবে আকারে সবচেয়ে বড়ো। আর হয়েছেও ঠিক তাই। চুরুটের ঠিক মাঝখানে যে ফোঁটাটি তৈরি হয়েছে তার ব্যাস প্রায় নব্বুই হাজার মাইল। এই ফোঁটাগুলোই হচ্ছে এক একটি গ্রহ।
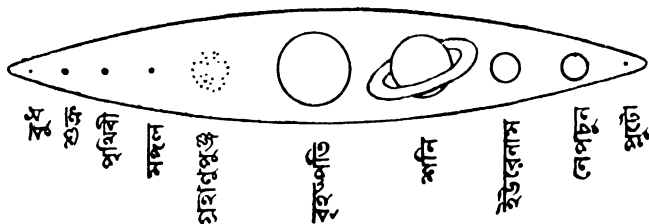
এই ফোঁটাগুলো কি আবার সূর্যের টানে ফিরে গিয়ে সূর্যের শরীরের মধ্যেই ঢুকবে? সেই নক্ষত্র ইতিমধ্যে বহুদূরে চলে গিয়েছে, সুতরাং ফোঁটাগুলোর উপরে সূর্যের টানই এখন সবচেয়ে প্রবল। ভ্যাকুয়ামের টানে ভাসমান ধুলো যেমন ভ্যাকুয়ামের গর্তের মধ্যে এসে ঢোকে তেমনি সূর্যের টানে এই ভাসমান ফোঁটাগুলোও সূর্যের বস্তুপুঞ্জের আশ্রয়ে এসে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যায়, ফোঁটাগুলো শূন্যেই অবস্থান করছে, সূর্যের টানে সূর্যের বস্তুপুঞ্জের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে না।

কেন? কারণ ফোঁটাগুলো নিশ্চল নয়। সেই নক্ষত্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে অতিকায় চুরুটটাও গতি সঞ্চয় করেছিল এবং ফোঁটাগুলোও গতি

সঞ্চয় করেছে। তাহলে আসলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই ঃ প্রত্যেকটি ফোঁটাকে সূর্য টানছে নিজের দিকে, আবার প্রত্যেকটি ফোঁটা নিজস্ব গতির রেখাপথে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে সরাসরি মহাশূন্যের দিকে। এই দুয়ের ফল হয় এই যে, ফোঁটাটি সূর্যের চারদিকে পাক খেতে শুরু করে। অর্থাৎ আবার সেই টান আর ছুটের ব্যাপার। টান চায় ঘরমুখী করতে, ছুট চায় মহাশূন্যে পাড়ি দিতে—ফলে কোনটাই না হয়ে শুধু রেসের ঘোড়ার মতো ঘুরতে হয় চক্রাকারে। মাধ্যাকর্ষণের এই সহজ নিয়মটি সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী হয় বলেই এই মহাবিশ্বে এমন একটা শৃঙ্খলা বজায় আছে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র—প্রত্যেকেরই পরিক্রমা এক-একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। সর্বত্রই টান আর ছুটের ব্যাপার। এই টান আর ছুটের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকছে বলেই মহাবিশ্বে ঠোকাঠুকি নেই।

নবগ্রহ

এবার আমাদের কল্পনার রকেট ছেড়ে আবার ফিরে আসা যাক বর্তমান কালের পৃথিবীতে। আমাদের এই সৌরমণ্ডলের জন্ম কি-ভাবে হয়েছে তা আমরা দেখলাম। আর এতক্ষণে আমরা একথাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এই সূর্য হচ্ছে সাধারণ একটি নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের অংশ থেকেই তৈরি হয়েছে সৌরমণ্ডলের নয়টি গ্রহ। অর্থাৎ সূর্য ও এই নয়টি গ্রহ একই উপাদানে তৈরি।

তবে নয়টি গ্রহ ছাড়াও আমাদের এই সৌরমণ্ডলে নানা ধরনের বস্তু-পিণ্ড আছে। না থাকাটাই অবাক হবার মতো ব্যাপার হত। সামান্য একটা চীনা মাটির পেয়ালাও যদি হাত থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে তা ছোট বড়ো নানা ধরনের ও আকারের টুকরোয় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে। আর যে বিপুল আলোড়ন ও ভাঙাভাঙির মধ্যে দিয়ে সৌরমণ্ডলের জন্ম—সেখানে নয়টি গ্রহ ছাড়াও যে আরও বিচিত্র সব বস্তুপিণ্ডের সমাবেশ হবে তা খুবই স্বাভাবিক। এইসব বস্তুপিণ্ডের কোনটা খুবই ছোট, কোনটা খুবই

বড়ো। কতকগুলি দলবদ্ধ কতকগুলি আলাদা আলাদা। কারও গতি বৃত্তাকার, কারও উপবৃত্তাকার, কারও অধিবৃত্তাকার। খুব সংক্ষেপে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।
সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ, সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো। বুধ থেকে প্লুটো পর্যন্ত নয়টি গ্রহের পরপর অবস্থান হচ্ছে এই ঃ

বুধ
শুক্র
পৃথিবী
মঙ্গল
বৃহস্পতি
শনি
ইউরেনাস
নেপচুন
প্লুটো

এই নয়টি গ্রহ ও সূর্যের পারস্পরিক আকার ও দূরত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলবার জন্যে খুব ছোট স্কেলে সৌর-মণ্ডলের একটা ছবি আঁকা যেতে পারে।
পৃথিবীকে যদি কল্পনা করা হয় সর্ষের একটা দানা হিসেবে তাহলে সূর্য হবে একটা সুপুরির মতো, বুধ হবে ধুলোর একটা কণার মতো, শুক্র হবে একদানা পোস্তর মতো, মঙ্গল হবে একদানা বালির মতো, বৃহস্পতি ও শনি হবে সামান্য বড়ো-ছোট এক-একটা মটরদানার মতো, তেমনি ইউরেনাস ও নেপচুন সামান্য বড়ো-ছোট এক-এক দানা কলাইয়ের মতো। প্লুটো সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়, খুব সম্ভবতঃ এই গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে সামান্য ছোট।
এবার কল্পনা করা যাক, কলকাতার পার্ক স্ট্রীট থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল পর্যন্ত যে বিস্তৃত ময়দান আছে—তার ঠিক মাঝখানে আছে সুপুরির মতো সূর্য। তাহলে সূর্য থেকে প্রায় ৪ গজ দূরে

আছে ধুলোর একটা কণার মতো বুধগ্রহ, ৭ গজের সামান্য একটু বেশি দূরে একদানা পোস্তর মতো শুক্রগ্রহ, ১০ গজ দূরে একদানা সর্ষের মতো পৃথিবী, ১৫ গজের সামান্য একটু বেশি দূরে একদানা বালির মতো মঙ্গলগ্রহ, ৫২ গজের সামান্য একটু বেশি দূরে বড়ো আকারের মটরদানার মতো বৃহস্পতি, প্রায় ৯৫½ গজ দূরে ছোট আকারের মটরদানার মতো শনিগ্রহ, প্রায় ১৯২ গজ দূরে বড়ো আকারের কলাইদানার মতো ইউরেনাস, ৩০০ গজ দূরে ছোট আকারের কলাইদানার মতো নেপচুন এবং ৩৯৮ গজ দূরে প্লুটো। অর্থাৎ প্লুটোর কক্ষপথ একদিকে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং অপরদিকে আউটরামের মূর্তিকে ছুঁয়ে বেরিয়ে যাবে।

খুব ছোট স্কেলে এই যে সৌরমণ্ডলের ছবি আঁকা হল, একে প্রায় ১,৬৫০ কোটি গুণ বড়ো করে ভাবতে পারলে মহাকাশের সৌর-মণ্ডলের একটা মোটামুটি ছবি পাওয়া যাবে। এই ছবি থেকে কল্পনা করা শক্ত নয় যে সৌরমণ্ডলের প্রায় সবটাই শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু পরে আমরা দেখব, মহাকাশে আমাদের এই সৌরমণ্ডলটাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘিঞ্জি জায়গা।

অথচ এই ঘিঞ্জি জায়গাতেও এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহ এতটা দূরে দূরে যে প্রায় ৯০ হাজার মাইল ব্যাসের বৃহস্পতিকেও পৃথিবী থেকে ফুলঝুরির একটা ফুলকির চেয়ে বড়ো দেখায় না!

সূর্য সম্পর্কে পরে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আপাতত এটুকু জেনে রাখা দরকার যে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে আছে বলেই সূর্য স্থির বা নিশ্চল নয়। গ্রহগুলির মতো সূর্যেরও দরবেশী নাচের পাক আছে, আবার সামনের দিকে ছোটাও আছে। প্রায় ২৫ দিনে একবার সূর্য নিজের চারদিকে দরবেশী নাচের বা লাট্টুর পাক খাচ্ছে আর ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল ছুটে চলেছে 'লীরা' তারামণ্ডলের দিকে। বলা বাহুল্য সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য বস্তুপিণ্ডও একই গতিতে ছুটে চলে। সমস্ত সৌরমণ্ডলের এই গতির কথা আপাতত আমাদের বিবেচনা না করলেও চলবে। প্রথমে দেখা যাক, সূর্যের

চারদিকে বিভিন্ন গ্রহের চক্রাবর্তনে বিশেষ কোন নিয়ম আছে কিনা।

মাধ্যাকর্ষণের টান গ্রহগুলিকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। মাধ্যাকর্ষণের টান আছে বলেই গ্রহগুলি সরাসরি মহাশূন্যে ছুট দিতে পারে না। আবার গ্রহগুলি সব সময়ে মহাশূন্যে সরাসরি ছুট দিতে চায় বলেই মাধ্যাকর্ষণের টানে গ্রহগুলি সূর্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। এই টান আর ছুটের মোট ফলটা দাঁড়ায় এই যে, গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কিন্তু চক্রগতিরও একটা নিয়ম আছে। এই চক্রগতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন কেপ্‌লার নামে একজন মহাবিজ্ঞানী।

কেপ্‌লার তিনটি সূত্রের সাহায্যে এই চক্রগতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সূত্র তিনটি হচ্ছে এই :

(১) গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার ; সূর্য থাকে উপবৃত্তের একটি ফোকসে।

(২) সূর্য ও গ্রহকে যদি একটি সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় তবে সেই সরল রেখাটি সমান সমান সময়ের মধ্যে সমান সমান ক্ষেত্রফল পেরিয়ে আসে।

(৩) কোন একটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে যতোটা সময় নেয় এবং গ্রহটি সূর্য থেকে মোটামুটি যতোটা দূরে আছে—এই বিশেষ গ্রহের এই সময় ও দূরত্বের সঙ্গে অন্য কোন বিশেষ গ্রহের এই সময় ও দূরত্বের একটা সম্পর্ক আছে।

প্রথম সূত্রটি থেকে বোঝা যায় যে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। কোন সময়ে গ্রহটি সূর্যের খুব কাছে আসে, কোন সময়ে খুব দূরে চলে যায়। গ্রহটি যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি—গ্রহের সেই অবস্থানের নাম অপসূর ; গ্রহটি যখন সূর্যের সবচেয়ে দূরে—গ্রহের সেই অবস্থানের নাম অনুসূর।

দ্বিতীয় সূত্র থেকে বোঝা যায় যে সূর্য থেকে গ্রহটির দূরত্ব বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহটির গতিও কমে-বাড়ে। এ-ব্যাপারটা অবশ্য সাধারণ

বুদ্ধি থেকেও বুঝে নেওয়া চলে। গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি—গ্রহের উপরে সূর্যের টানও তখন সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সেই গ্রহের
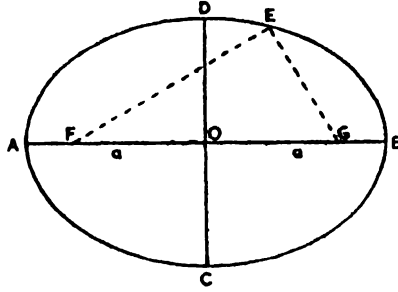
উপরের ছবিটি একটি উপবৃত্তের। ছবিটির দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে, উপবৃত্তের চেহারা ঠিক ডিমের মতো। AOB ও DOC উপবৃত্তের দুটি অক্ষ। AOB-কে বলা হয় পরাক্ষ, DOC-কে উপাক্ষ। পরাক্ষ ও উপাক্ষ একটি অপরটির উপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অর্থাৎ পরাক্ষ ও উপাক্ষ পরস্পর লম্ব। এই পরাক্ষ ও উপাক্ষকে ঘিরে উপবৃত্তের পরিধি যেন একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বজায় রেখে চলছে। AO বা OB-কে বলা হয় অর্ধ-পরাক্ষ এবং সাধারণতঃ 'a' অক্ষরটির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। F ও B—এই দুটি বিন্দুকে বলা হয় উপবৃত্তের ফোকস এবং দুটি বিন্দুই রয়েছে পরাক্ষে। O হচ্ছে উপবৃত্তের কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্র থেকে দু-দিকের দুটি ফোকস সমান দূরে আছে। মনে করা যাক, উপবৃত্তের পরিধিতে E যে-কোন একটি বিন্দু। প্রমাণ করা যায় যে দুটি ফোকস থেকে এই বিন্দুটির দূরত্বের যোগফল পরাক্ষের সমান, বা অঙ্কের ভাষায় লিখলে $FE+GE=2a$। বৃত্তের সঙ্গে উপবৃত্তের চেহারার তফাৎ চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার উপবৃত্তেরও নানা ধরনের চেহারা হতে পারে—চেহারার বিশেষ ধরনটি নির্ভর করে দুটি ফোকসের মাঝখানকার দূরত্বের উপরে এবং পরাক্ষের দৈর্ঘ্যের উপরে। ছবি থেকে বোঝা যাবে, ফোকসদুটির মাঝখানকার দূরত্ব হচ্ছে FG এবং পরাক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2a বা $FE+GE$। এই দুটি দৈর্ঘ্য—অর্থাৎ FG এবং 2a—মাপের দিক থেকে যতো কাছাকাছি আসবে, উপবৃত্তটি ততো লম্বাটে হবে; আর FG-র মাপ 2a-র তুলনায় যতো ছোট হবে, উপবৃত্তটি ততো বৃত্তাকার হবে। উপবৃত্তের পরিধি হচ্ছে গ্রহের কক্ষপথ আর সূর্য থাকে F বা G বিন্দুতে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সূর্য আছে F বিন্দুতে, তাহলে গ্রহটির A বিন্দুতে অবস্থানের নাম অপসূর, B বিন্দুতে অবস্থানের নাম অনুসূর।

গতিও যদি সবচেয়ে বেশি না হয় তাহলে সূর্য অনায়াসে টান মেরে গ্রহটিকে কক্ষ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত। তা পারে না কারণ সূর্যের টান বাড়বার সঙ্গে গ্রহের ছুটও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। এই জন্যেই দেখা যায়, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধের ছুটের পরিধি যদিও খুবই
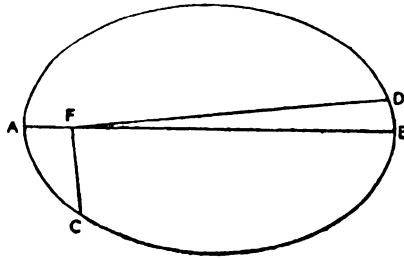
হ যখন অপসূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ A বিন্দুতে থাকে—তখন তার বগ ; এবং যখন অনুসূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ B বিন্দুতে থাকে—র সর্বনিম্ন বেগ। AC দূরত্ব অতিক্রম করতে গ্রহটির যে সময় লাগবে, সেই একই সময় লাগবে BD দূরত্ব অতিক্রম করতে।

ছোট—কিন্তু ছুট দেয় সবচেয়ে জোরে। আর সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো—তার ছুটের পরিধিও যেমন সবচেয়ে বড়ো, ছুটের চলনও সবচেয়ে গদাইলস্করি। প্লুটোর এই গদাইলস্করি চালটা চট্ করে হয়নি—প্লুটো ও বুধগ্রহের মাঝখানের আরও সাতটি গ্রহের কক্ষপথে আস্তে আস্তে প্রকাশ পেয়ে এসেছে। একটা চাকা যখন ঘুরতে শুরু করে তখন দেখা যায় চাকার পরিধির কোন বিন্দু ঘোরে সবচেয়ে জোরে, আর যতোই চাকার কেন্দ্রের দিকে আসা যায় ততোই ঘোরার জোর কমে। কিন্তু সৌরমণ্ডলকে যদি বিরাট একটা চাকা হিসেবে কল্পনা করা যায় তাহলে এখানে কিন্তু ঘোরার নিয়মটা একেবারে উল্‌টো। পরিধির দিকে পাল্লাও যেমন দূর, ছুটও তেমনি আস্তে, কেন্দ্রের দিকে পাল্লা কমে ছুট বাড়ে। এই ব্যাপারটাই সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে কেপ্‌লারেরতৃতীয় নিয়মে। *

---

* বীজগণিতের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলে কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটির চেহারা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই :

$$\frac{a_1^3}{p_1^2} = \frac{a_2^3}{p_2^2} = \frac{a_3^3}{p_3^2}$$

a_1, a_2, a_3 হচ্ছে এক একটি গ্রহের সূর্য থেকে মোটামুটি দূরত্ব এবং p_1, p_2, p_3 হচ্ছে সেই-সেই বিশেষ গ্রহের কক্ষ-পরিক্রমার সময়।

কেপ্‌লারের সূত্রগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য আমাদের এই সৌর-মণ্ডলের সূর্য ও গ্রহের ক্ষেত্রে। পরে নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র
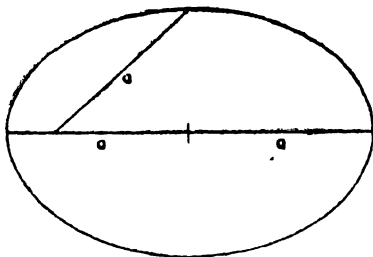
যদি সূর্য থেকে কোন গ্রহের মোটামুটি দূরত্বকে ধরে নেওয়া হয় a, (এই দূরত্বকে হিসেব করা হবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে একক ধরে নিয়ে— অর্থাৎ, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি হয় ১০০, তাহলে বুধের দূরত্ব ০·৩৯, শুক্রের দূরত্ব ০·৭২, মঙ্গলের দূরত্ব ১·৫২, ইত্যাদি) আর P যদি হয় বছরের হিসেবে সূর্য-প্রদক্ষিণের সময়, তাহলে কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্র অনুসারে $P^2 = a^3$ ।

আবিষ্কার করলেন, একমাত্র তখনই এই মহাবিশ্বের গতি-প্রকৃতির সাধারণ নিয়মটির সন্ধান পাওয়া গেল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটি সহজ ভাষায় এইভাবে বিবৃত করা যায়ঃ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে আকর্ষণ করে ; বস্তু দুটির ভরের গুণফলকে বস্তু দুটির দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে এই আকর্ষণের জোর।

যেমন, সূর্য এই পৃথিবীকে টানছে, আবার পৃথিবীও সূর্যকে টানছে। কিন্তু সূর্যের টানটা পৃথিবীর টানের চেয়ে এত বেশি যে এই টানাটানির ভারকেন্দ্রটা সূর্যের মধ্যেই গিয়ে পড়ে। যেমন, পৃথিবী মানুষকে টানছে, আবার মানুষও পৃথিবীকে টানছে—কিন্তু প্রথম টানটা অপর টানের চেয়ে এত বেশি যে টানাটানির ভারকেন্দ্রটা থাকে পৃথিবীর কেন্দ্রেই। সূর্য ও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে ফিরে যাওয়া যাক। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটা যদি এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবী ও সূর্যের টানাটানির জোর হয়ে যাবে এখনকার চারভাগের একভাগ—ফলে পৃথিবীর ছোটার বেগ (বা চক্রবেগ)

কমে যাবে সেই অনুপাতে। সূর্য থেকে কোন গ্রহের দূরত্ব যদি হয় ৩,৬০,০০,০০০ মাইল তাহলে সেই গ্রহের চক্রবেগ হবে ঘণ্টায় ১,০৮,০০০ মাইল ; যদি দূরত্ব হয় ৬,৭০,৩০,০০০ মাইল, তাহলে চক্রবেগ হবে ঘণ্টায় ৭৮,১২০ মাইল ; যদি দূরত্ব হয় ৯,৩০,০৯,০০০ মাইল, তাহলে চক্রবেগ হবে ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল। এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর দূরত্ব ও চক্রবেগের হিসেব। দূরত্ব ও চক্রবেগের সম্পর্কটা ছবি এঁকে দেখানো যেতে পারে। এই ধরনের ছবিকে ইংরেজিতে বলে গ্রাফ, বাংলায় 'লেখ'। আমরা 'গ্রাফ' শব্দটাই ব্যবহার করব। কোন দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝাবার জন্যে গ্রাফ আঁকার সুবিধা হচ্ছে এই যে, গ্রাফের দিকে একনজর তাকিয়েই
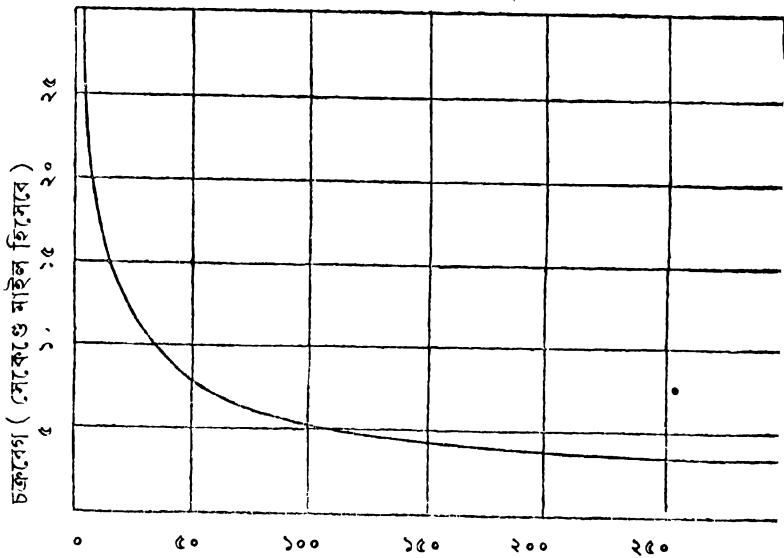
আগাগোড়া সম্পর্কটা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যায়। যেমন উপরের ছবিটির দিকে তাকানো যাক। এই ছবিটিতে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে দূরত্বের (কোটি মাইল হিসেবে) সঙ্গে চক্রবেগের (সেকেণ্ডে মাইল হিসেবে)। এই ছবিটির দিকে একবার তাকিয়েই বলে দেওয়া চলে যে দূরত্ব যতো কমে গতিবেগ ততো বাড়ে। আবার কোন এক

বিশেষ দূরত্বে গতিবেগ ঠিক কত—তাও বলে দেওয়া চলে এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে। যেমন, দূরত্ব যদি হয় ১০০ কোটি মাইল তাহলে গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ৫ মাইলের কিছু বেশি। কতটা বেশি তাও হিসেব করে নেওয়া চলে। দূরত্ব হয় ১৫০ কোটি মাইল তাহলে গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ৫ মাইলের কিছু কম—কতটা কম তাও সামান্য হিসেবের ব্যাপার। এই বইয়ের শেষদিকে ছক কেটে সূর্য থেকে প্রত্যেকটি গ্রহের দূরত্ব এবং গতিবেগ দেওয়া আছে। উপরের ছবির সঙ্গে ছকের সংখ্যাগুলি মিলিয়ে দেখা চলতে পারে।

মহাকায়

সৌরমণ্ডলের নটি গ্রহের মধ্যে শুক্র ও বুধের পরিচয় আমরা পেয়েছি, পৃথিবীর পরিচয় আমরা মোটামুটি জানি—তাহলে বাকি থাকে আরো ছ-টি গ্রহ। আর ছ-টি গ্রহই আছে পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরের দিকে। অর্থাৎ সূর্য থেকে এই ছ-টি গ্রহেরই দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশি। এই ছ-টি বাইরের গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বাইরের দিকে আছে প্লুটো। সূর্য থেকে এই গ্রহটির মোটামুটি দূরত্ব হচ্ছে ৩৬৭ কোটি মাইল, কক্ষপথে ছোটার বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১০,৪৪০ মাইল বা সেকেণ্ডে ২.৯ মাইল, একবার পরিক্রমা শেষ করতে সময় নেয় প্রায় ২৪৮ বছর। প্লুটো সম্পর্কে এছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মঙ্গলগ্রহের খবর আমাদের বিস্তৃততর ভাবে জানতে হবে। তার আগে অন্য চারটি গ্রহ সম্পর্কে মোটামুটি খবর সংগ্রহ করে নেওয়া যাক।

অন্য চারটি গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। চারটিকেই বলা যায় মহাকায় গ্রহ—কারণ এদের প্রত্যেকেরই তুলনায় পৃথিবী নেহাৎ বামন ছাড়া কিছু নয়। কথাটা পরিষ্কার হবে যদি গ্রহ চারটির ব্যাস আমরা জেনে নিতে পারি।

পৃথিবীর ব্যাস, আমরা জানি, প্রায় ৮,০০০ মাইল। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বিষুব অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে ৭,৯২৬ মাইল আর

মেরুপ্রদেশে ৭,৯০০ মাইল। বৃহস্পাতর ব্যাস—বিষুব অঞ্চলে ৮৮,৭০০ মাইল, মেরু অঞ্চলে ৮২,৭৮০ মাইল। অর্থাৎ বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০'৯৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ পৃথিবী মহাশূন্যের যতোটা জায়গা জুড়ে আছে, বৃহস্পতি জুড়ে আছে তার চেয়ে ১৩১২ গুণ বেশি। কক্ষপথে পৃথিবীর ছোটার বেগ ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল বা সেকেণ্ডে ১৮'৫ মাইল। বৃহস্পতির ছোটার বেগ ঘণ্টায় ২৯,১৬০ মাইল বা সেকেণ্ডে ৮'১ মাইল। বৃহস্পতি সূর্য-পরিক্রমা শেষ করে ১১'৮৬ বছরে। সূর্য থেকে মোটামুটি দূরত্ব ৪৮,৩৯,০০,০০০ মাইল।

শনিগ্রহের ব্যাস—বিষুব অঞ্চলে ৭৫,০৬০ মাইল, মেরু অঞ্চলে ৬৭,১৬০ মাইল ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ৯'০২ গুণ বেশি, আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর চেয়ে ৭৩৪ গুণ বেশি জায়গা জুড়ে আছে। ছোটার বেগ ঘণ্টায় ২১,৬০০ মাইল বা সেকেণ্ডে ৬ মাইল, সূর্য-পরিক্রমা ২৯'৪৬ বছরে। সূর্য থেকে দূরত্ব ৮৮,৭১,০০,০০০ মাইল।

ইউরেনাসের ব্যাস ৩০,৮৮০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ৪ গুণ বেশি। ৬৪ গুণ বেশি আয়তন। ছোটার বেগ ঘণ্টায় ১৫,১২০ মাইল বা সেকেণ্ডে ৪'২ মাইল। সূর্য-পরিক্রমা ৮৪'০১ বছরে। সূর্য থেকে দূরত্ব ১৭৮,৩০,০০,০০০ মাইল।

নেপচুনের ব্যাস ৩২,৮৪০ মাইল, পৃথিবীর চেয়ে ৩'৯২ গুণ বেশি। ৬০ গুণ আয়তন। ছোটার বেগ ঘণ্টায় ১২,২৪০ মাইল বা সেকেণ্ডে ৩'৪ মাইল। সূর্য-পরিক্রমা ১৬৪'৭৯ বছরে। সূর্য থেকে দূরত্ব ২৭৯,৭০,০০,০০০ মাইল।

মহাকায় গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে কাছের ও সবচেয়ে বড়ো গ্রহটি হচ্ছে বৃহস্পতি। খুব ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও বৃহস্পতিকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। বৃহস্পতি যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তখনো একটা মাঝারি গোছের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বৃহস্পতিকে দেখায় চাঁদের মতো বড়ো আকারে। কিন্তু চাঁদের মতো নিটোল গোল নয়—উপরে-নিচে একটু চ্যাপ্‌টা। আর দেখা যাবে টানা-টানা

কালো কালো কতগুলি দাগ। এই কালো দাগগুলির যে কোন একটা বিন্দুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, বিন্দুটি একদিকে সরে সরে যাচ্ছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর আবার ঘণ্টা দশেক পরে আগের জায়গায় ফিরে আসে। এ থেকে বোঝা যায় বৃহস্পতিগ্রহের দরবেশী নাচের এক-একটা পাক দশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। এত দ্রুত আবর্তন সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহের নেই।

বৃহস্পতি গ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৩৮ মাইল। আমরা জানি পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ৭ মাইল। যেখানে নিষ্ক্রমণ-বেগের মাপ সেকেণ্ডে মাত্র সাত মাইলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে—সেখানে সেকেণ্ডে ৩৮ মাইলের এলাকায় বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে হাল্‌কা কণাটিও মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দিতে পারে না। সুতরাং আশা করা যেতে পারে, বৃহস্পতিগ্রহে বায়ুমণ্ডল পুরোমাত্রায় বর্তমান আছে এবং সেখান থেকে হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম ধরনের হাল্‌কা কণাগুলোও বেরিয়ে যেতে পারেনি। পর্যবেক্ষণের ফলে এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই গ্রহটির উপরিতলের উত্তাপ হচ্ছে মাত্র—১৪০° সেন্টিগ্রেড, হিমাঙ্কের. চেয়েও ১৪০° কম। সুতরাং বৃহস্পতি গ্রহে জল কিছুতেই তরল অবস্থায় থাকতে পারে না—জমে বরফ হয়ে আছে। কিন্তু এই গ্রহটির ঘনত্ব (জলের ঘনত্বকে যদি ধরা হয় ১·০০) মাত্র ১·৩৪। যেখানে পৃথিবীর ঘনত্ব হচ্ছে ৫·৫২, চাঁদের ঘনত্ব ৩·৩৩, শুক্রের ঘনত্ব ৫·২১, বুধের ঘনত্ব ৩·৭৩—সেখানে বৃহস্পতির ঘনত্ব ১·৩৪ হওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হতে পারে। এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক—এবং গ্রহটির ব্যাসের মাপের মধ্যে এই বায়ুমণ্ডলেরও অনেকখানি ধরা হয়ে যায়। অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস বলতে যে মাপটা আমরা ধরে নিই—তা তার সত্যিকারের মাপ নয়।

নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে ও পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা বৃহস্পতি গ্রহের যে ছবি এঁকেছেন তা হচ্ছে এই : তিনটি স্তর নিয়ে এই গ্রহটি তৈরি। একেবারে নিচে পাথুরে স্তর, তার উপরে বরফের স্তর, তার উপরে বায়ুমণ্ডলের স্তর। দেখা যাচ্ছে, এই তিনটি স্তরের মধ্যে উপরের দুটি স্তরেরই (অর্থাৎ বরফের স্তর ও বায়ুমণ্ডলের স্তর) ঘনত্ব জলের চেয়ে কম *। বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস বলে যে মাপটা আমরা জানি তার মধ্যে বরফের স্তরের সবটাই এবং বায়ুমণ্ডলের অনেকটাই চলে আসে—ফলে সব মিলিয়ে গ্রহটির ঘনত্ব এত কমে যায়।

বৃহস্পতি গ্রহের কোন্ স্তর কতটা গভীর তাও বৈজ্ঞানিকরা মোটামুটি হিসেব করেছেন। সবচেয়ে নিচের পাথুরে স্তরের ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্রায় ২২,০০০ মাইল, পাথুরে স্তরের উপরে প্রায় ১৬,০০০ মাইল গভীর বরফের স্তর, আর সবচেয়ে উপরের বায়ুমণ্ডলের স্তরের গভীরতা হচ্ছে ৬,০০০ মাইল।

বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে কোন্ কোন্ গ্যাসের প্রাধান্য তাও বৈজ্ঞানিকদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। নানাভাবে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের একেবারেই মিল নেই। বৃহস্পতি গ্রহের বায়ু-মণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি হাল্কা গ্যাস—যা এককালে এই পৃথিবীতেও ছিল কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর বিবর্তনের বিশেষ এক অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দিয়েছে। বৃহস্পতি গ্রহে এছাড়াও আছে আর্গন ক্রিপ্টন ইত্যাদি ধরনের নিষ্ক্রিয় গ্যাস, বিষাক্ত জলা-গ্যাস ও এ্যামোনিয়া গ্যাস। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। অক্সিজেন গ্যাসের এবং খুব সম্ভবতঃ

---

* বরফের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম—একথাটা মনে রাখা দরকার। জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয় ৪° সেন্টিগ্রেডে, অর্থাৎ হিমাঙ্কের চেয়েও চার ডিগ্রি বেশি উত্তাপে। তারপরেই জলের ঘনত্ব কমে যায়। এই জন্যেই জল বরফ হলে আয়তনে বাড়ে।

নাইট্রোজেন গ্যাসেরও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডল কেন এই রকমটিই হয়েছে, কেন অন্য কোন রকম হয়নি—তাও বৈজ্ঞানিকরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের চেহারাও মোটামুটি এই একই ধরনের।

শনিগ্রহ ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে একবার দরবেশী নাচের পাক খায়। অর্থাৎ শনিগ্রহের চরকিপাক খাওয়াটা বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে সামান্য একটু আস্তে আস্তে। শনিগ্রহের উপরিতলের উত্তাপ—১৫৫° সেণ্টিগ্রেড, বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে ১৫° কম—হিমাঙ্কের ১৫৫° নিচে। শনিগ্রহের ঘনত্ব হচ্ছে ০·৭১। এমন কি সূর্যের ঘনত্বও শনিগ্রহের ঘনত্বের দ্বিগুণ—অথচ আমরা জানি সূর্যলোকে প্রত্যেকটি উপাদানই আছে গ্যাসীয় অবস্থায়। এখানেও সেই একই কারণ। শনিগ্রহেরও তিনটি স্তর আছে—সবচেয়ে নিচের পাথুরে স্তর, তার উপরে বরফের স্তর, তার উপরে বায়ুমণ্ডলের স্তর। পাথুরে স্তরের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ১৪,০০০ মাইল, বরফের স্তরের গভীরতা ৬,০০০ মাইল, বায়ুমণ্ডলের স্তরের গভীরতা ১৬,০০০ মাইল। শনিগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ২৩ মাইল, সুতরাং গ্রহটিতে যে গভীর বায়ুমণ্ডলের স্তর থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি মোটামুটি বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলের মতোই।

ইউরেনাস গ্রহের চরকিপাক ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে, নেপচুনের ১৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে। ইউরেনাসের উপরিতলের উত্তাপ—১৮০° সেণ্টিগ্রেড। নেপচুনের উত্তাপ নিশ্চয়ই আরো অনেক কম। ইউরেনাসের ঘনত্ব ১·২৭, নেপচুনের ঘনত্ব ১·৫৮। এই দুইটি গ্রহেও তিনটি করে স্তর আছে। ইউরেনাস গ্রহে নিচের পাথুরে স্তরের ব্যাসার্ধ ৭,০০০ মাইল, বরফের স্তরের গভীরতা ৬,০০০ মাইল, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ৩,০০০ মাইল। নেপচুন গ্রহে পাথুরে স্তর ও বরফের স্তরের মাপ ইউরেনাস গ্রহের মতোই—তবে বায়ুমণ্ডলের স্তরের গভীরতা ২,০০০ মাইল। ইউরেনাস গ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১৪ মাইল।

এবং নেপচুন গ্রহ থেকে সেকেণ্ডে ১৫ মাইল। এই দুই গ্রহেই বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের মতোই।

লুপ্তপ্রায় জীবনের দেশ

সৌরমণ্ডলের নয়টি গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল। কারণ সৌরমণ্ডলে এই একটিমাত্র গ্রহই আছে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

এতক্ষণ ধরে আমরা অন্যান্য যে-সব গ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা গেছে। খুব ছোট গ্রহে বা খুব বড়ো গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। ছোট ছোট গ্রহে মাধ্যাকর্ষণের টান এত দুর্বল যে বায়ুমণ্ডল অনায়াসেই সেই টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দেয়। আবার খুব বড়ো বড়ো গ্রহে এই মাধ্যাকর্ষণের টান এত জোরালো যে হাইড্রোজেন বা হিলিয়ামের মতো হাল্‌কা ধাতুও সেই টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে সেখানকার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মতো না হয়ে, হয়ে ওঠে নানা বিষাক্ত গ্যাস এবং মিথেন ও এ্যামোনিয়ার সংমিশ্রণ। সুতরাং পৃথিবীর মতো মাঝারি আকারের গ্রহেই জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এমনি গ্রহ সৌরমণ্ডলে আরো দুটি আছে—বুধ ও মঙ্গল। বুধগ্রহ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেখানে এখনো জীবনের অস্তিত্ব থাকার মতো আবহাওয়া তৈরি হয়নি। তবে অনুমান করা চলে যে বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কয়েক লক্ষ বছর পরে বুধগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকার উপযোগী আবহাওয়া তৈরি হবে।

বাকি থাকে মঙ্গলগ্রহ। এই গ্রহটি আকারে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক : গ্রহটির ব্যাস ৪,২১৬ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর আকারকে যদি ধরা হয় ১০০, তাহলে মঙ্গলগ্রহের আকার হবে ৫৩। গ্রহটির ঘনত্ব ৩'৯৪। আর পৃথিবীর ভরকে যদি ধরা হয় ১'০০০, তাহলে মঙ্গল-গ্রহের ভর হবে ০'১০৮। এসব সংখ্যা থেকে অনায়াসেই হিসেব

করে নেওয়া চলে মঙ্গলগ্রহে মাধ্যাকর্ষণের টান কত হবে। দেখা গেছে, পৃথিবীর টানের তুলনায় মঙ্গলগ্রহের টান পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। অর্থাৎ, পৃথিবীতে যদি কেউ তিনফুট হাইজাম্প দিতে পারে তাহলে মঙ্গলগ্রহে সে হাইজাম্প দেবে পাঁচফুট।

কক্ষপথে মঙ্গলগ্রহের ছোটার বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ৫৪,০০০ মাইল, বা সেকেণ্ডে ১৫ মাইল। ৬৮৭ দিনে মঙ্গলগ্রহের একবার সূর্য-পরিক্রমা শেষ হয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৩৭½ মিনিটে গ্রহটি একবার দরবেশী নাচের পাক খায়।

সূর্য থেকে মঙ্গলগ্রহের মোটামুটি দূরত্ব ১৪,১৭,০০,০০০ মাইল। তবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ এতবেশি উপবৃত্তাকার যে মঙ্গলগ্রহের ৬৮৭ দিনের একটি বছরে এই দূরত্ব প্রায় ২·৬ কোটি মাইল বাড়ে কমে। মঙ্গলগ্রহ কখনো থাকে সূর্য থেকে ১২,৮০,০০,০০০ মাইলের মধ্যে, কখনো চলে যায় ১৫,৫০,০০,০০০ মাইল দূরে। ঠিক এমনিভাবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও বাড়ে কমে। কখনো তা হয় ৯,১৫,০০,০০০ মাইল, কখনো হয় ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল।

মঙ্গলগ্রহ, পৃথিবী ও সূর্যের পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটা সংজ্ঞা এখানে জেনে নিতে হবে।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীও ঘুরছে, সূর্যের চারদিকে মঙ্গলগ্রহও ঘুরছে। সুতরাং এমন এক-একটা সময় নিশ্চয়ই আসে যখন পৃথিবী, মঙ্গল ও সূর্য একই রেখায় চলে আসে। দু-রকম অবস্থায় এটা হতে পারে। একটা অবস্থা হচ্ছে এই যে, সূর্য থাকে পৃথিবী ও মঙ্গল-গ্রহের মাঝখানে। এই অবস্থাকে বলা হয় মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ। আবার এমনও হতে পারে যে পৃথিবী থাকে সূর্য ও মঙ্গলগ্রহের মাঝখানে। এই অবস্থাকে বলা হয় মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগ।

পৃথিবীর বাইরের দিকে যে ছটি গ্রহ আছে তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই এইভাবে পৃথিবীর সংযোগ বা প্রতিযোগ হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পৃথিবীর ভিতরের দিকে যে দুটি গ্রহ আছে—

অর্থাৎ বুধ ও শুক্র—তাদের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ হওয়াই সম্ভব, প্রতিযোগ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় ; কারণ কোন অবস্থাতেই সূর্য এবং বুধ বা শুক্রগ্রহের মাঝখানে পৃথিবী আসতে পারে না। আবার

সংযোগ প্রতিযোগ
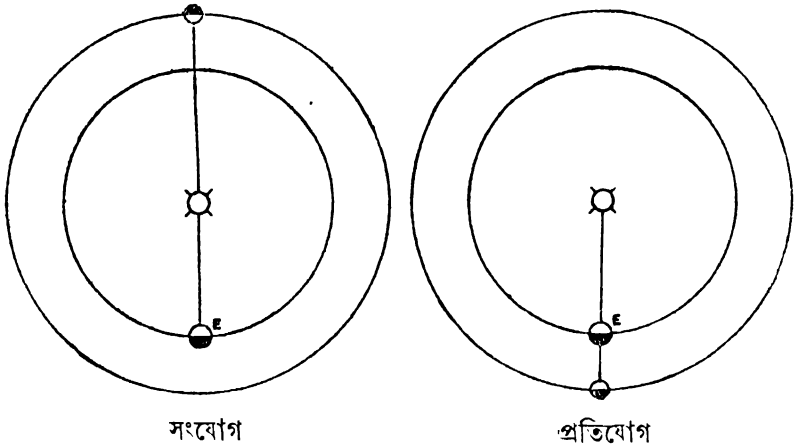
এই সংযোগও দু-ধরনের হওয়া সম্ভব। সূর্য থাকতে পারে গ্রহদুটির মাঝখানে, বা গ্রহদুটি থাকতে পারে সূর্যের একই দিকে। প্রথম অবস্থাটিকে বলা হয় বহিঃ-সংযোগ, দ্বিতীয় অবস্থাটিকে বলা হয় অন্তঃ-সংযোগ।

আমাদের আলোচনা আপাতত মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে। উপরে যে সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যখন প্রতিযোগ হয় একমাত্র তখনই এই দুটি গ্রহ সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসে। আবার পৃথিবীর কক্ষপথ এবং মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ একই সমতলে নেই বলে এই কাছাকাছি আসাটাও সব সময়ে একই মাপের কাছাকাছি হয় না। প্রতিযোগ অবস্থাতেও কখনো এই গ্রহদুটির মাঝখানে দূরত্ব থাকে সাড়ে-তিন কোটি মাইল, কখনো ছ-কোটি মাইলেরও উপরে। হিসেব করে দেখা গেছে, ৭৮০ দিন পরে পরে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগ ঘটে। এই ৭৮০ দিনের মধ্যে পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের মধ্যে কি-ভাবে ছাড়া-ছাড়ি হয়ে যায় আর কি-ভাবে সান্নিধ্য আসে তার একটা ছবি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।
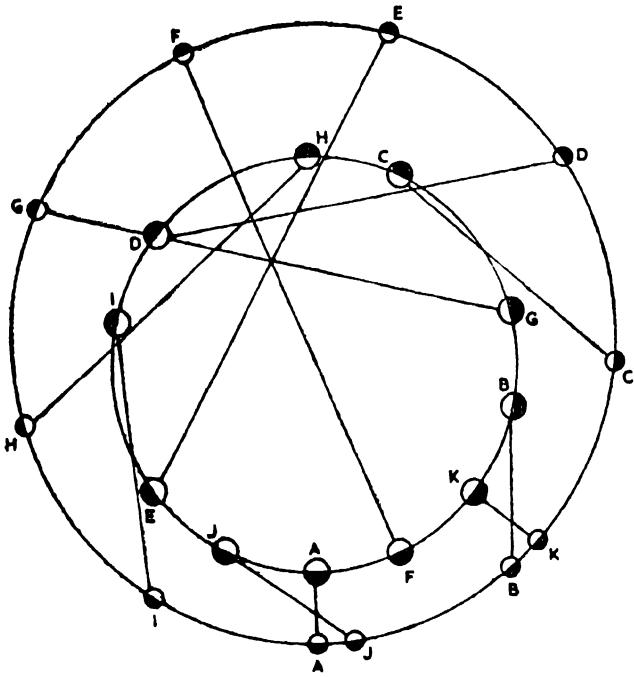
দিন	০	৭৮	১৫৬	২৩৪	৩১২	৩৯০	৪৬৮	৫৪৬	৬২৪	৭০২	৭৮০
মঙ্গল ও পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থান	A-A	B-B	C-C	D-D	E-E	F-F	G G	H-H	I-I	J-J	K-K
লক্ষ মাইলের হিসেবে মঙ্গল থেকে পৃথিবীর দূরত্ব	৩৬০	৬৩০	১৩২০	১৯২০	২৩৪০	২৪৪০	২১৪০	১৭৯০	১২৪০	৬০০	৪১০

এমনিভাবে বুধগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগের ব্যাপারটাও ছবি এঁকে দেখানো যেতে পারে। প্রতি ৫৮৪ দিন পরে পরে বুধগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অন্তঃ-সংযোগ ঘটে আর সেই অবস্থায় একটির থেকে অপরটি দূরত্ব হয় ২,৬০,০০,০০০ মাইল। এই হিসেব থেকে বোঝা যাবে সৌরমণ্ডলের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে গ্রহটি আসতে পারে তা হচ্ছে বুধ।

কিন্তু বুধগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পারে বটে কিন্তু পৃথিবী থেকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায় চাঁদের পরেই মঙ্গল-গ্রহকে। কারণ, বুধের সঙ্গে যখন পৃথিবীর অন্তঃ-সংযোগ ঘটে তখন পৃথিবী থেকে বুধের চেহারাটা দেখায় ঠিক একটা কাস্তের মতো, কিন্তু মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিযোগের সময় মঙ্গল-গ্রহের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ। তবে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণের অন্য অসুবিধে আছে। মঙ্গলগ্রহের গায়ে যে-সব সূক্ষ্ম কালো দাগ আছে তা ফটোগ্রাফিতে ধরা যায় না। শুধু চোখের দেখার উপরেই নির্ভর করতে হয়। তাও মঙ্গলগ্রহকে খুব ভালোভাবে দেখতে হলে পৃথিবীর আবহাওয়া খুব পরিষ্কার থাকা দরকার। এই-সব নানা কারণে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মঙ্গলগ্রহের চেহারার বিভিন্ন সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। খুব সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাগুলি জেনে নেওয়া যাক।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে প্রথমেই চোখে পড়ে মঙ্গল-গ্রহের মেরুপ্রদেশের সাদা টুপি। উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই এই সাদা টুপি আছে। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেরুপ্রদেশের সাদা টুপিও নিয়মিতভাবে বাড়ে, কমে বা একেবারে ক্ষয়ে যায়। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন উত্তরমেরুর টুপিটি ছোট হতে শুরু করে এবং দক্ষিণ মেরুর টুপিটি বাড়তে থাকে। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন ঠিক উল্টো ব্যাপারটি ঘটে। এথেকে অনুমান করে নেওয়া চলে যে মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশের এই সাদা টুপি আসলে বরফ ছাড়া কিছু নয়।

মেরুপ্রদেশের সাদা টুপির কথা বাদ দিলে মঙ্গলগ্রহের অন্যান্য অংশ কোথাও কালো, কোথাও লালচে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কালো অংশগুলি হচ্ছে সমুদ্র আর লালচে অংশগুলি শুক্‌নো জমি। ১৮৭৭ সালে মঙ্গলগ্রহের প্রতিযোগের সময় শিচয়াপারেল্লি নামে একজন ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে মঙ্গলগ্রহের জমির উপরে মাকড়সার জলের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালো দাগ আছে। তিনি এই দাগগুলোর নাম দিলেন 'কানালি' ; ইংরেজি অর্থে চ্যানেল। কিন্তু 'ক্যানাল' বা খাল অর্থেই দাগগুলো পরিচিত হয়ে এসেছে। আসলে কিন্তু এগুলো মোটেই খাল নয়, কোন কোনটা ১২০ মাইল পর্যন্ত চওড়া।

যাই হোক, আমরা খালই বলছি। শিচয়াপারেল্লি নানাভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে এই খালগুলো বিভিন্ন সমুদ্রকে যুক্ত করছে, এবং খালগুলোর স্পষ্ট একটা জ্যামিতিক বিন্যাস আছে। এবং যেহেতু খালগুলোর জ্যামিতিক বিন্যাস আছে, অতএব খাল-গুলো নিশ্চয়ই কৃত্রিম, অতএব নিশ্চয়ই একদল বুদ্ধিমান জীব খালগুলো তৈরি করেছে।

তারপরে ১৮৯৪ সালে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক লাওয়েল মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, মঙ্গল-গ্রহের যে-সব অংশকে সমুদ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেইসব অংশেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালো দাগ আছে। এই কালো দাগগুলোকে যদি খাল বলে ধরে নেওয়া হয়—তাহলে কালো ছোপটুকু কিছুতেই সমুদ্র হতে পারে না। সমুদ্রের উপরে তো আর সত্যি সত্যিই খাল থাকতে পারে না! মঙ্গলগ্রহকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং নানা যুক্তিতর্ক তুলে শেষ পর্যন্ত লাওয়েল সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে মঙ্গলগ্রহের কালো ছোপগুলো আসলে উদ্ভিদে ঢাকা জমি। আর লালচে ছোপগুলো হচ্ছে একেবারে মরু অঞ্চল, সেদিকে উদ্ভিদের ছিটেফোঁটাও নেই।

লাওয়েল আরো দেখলেন যে মঙ্গলগ্রহের এসব দাগ ঋতুতে ঋতুতে পাল্‌টে যায়। এবং এই পরিবর্তনেরও একটা চক্রাবর্তন আছে। লাওয়েল সিদ্ধান্ত করলেন যে গ্রীষ্মঋতুতে মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশের বরফ গলে যায় আর সেই বরফগলা জল বইতে শুরু করে বিষুব-অঞ্চলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জলসিক্ত জমিতে উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করে। শিচয়াপারেল্লির একটি মতকে কিন্তু লাওয়েল পুরোপুরি মেনে নিলেন। লাওয়েল বললেন যে মঙ্গল গ্রহের খালগুলির স্পষ্ট একটা জ্যামিতিক বিন্যাস আছে। তাঁরও সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই খালগুলো কৃত্রিম এবং নিশ্চয়ই একদল বুদ্ধিমান জীবের তৈরি। এইসব কৃত্রিম খাল-খননের পিছনে তিনি একটি পরিকল্পনাও আবিষ্কার করলেন। পৃথিবীর মতো মঙ্গলগ্রহে সর্বত্র খাল-বিল-নদী-সমুদ্র নেই। জলের যোগান সেখানে বছরে মাত্র একটিবার। সুতরাং ব্যাপক এলাকা জুড়ে এমনভাবে খাল কাটা হয়েছে যে মেরুপ্রদেশের বরফ গলতে শুরু করলেই বরফগলা জল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এত বড়ো একটা পরিকল্পনাকে যে-গ্রহের জীবরা কার্যকরী করতে পেরেছে, তারা মানুষের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

এই হচ্ছে আগেকার কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতামত। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত দুজন বৈজ্ঞানিকই যে মূল বিষয়টির উপরে দাঁড়িয়ে আছেন তা হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের খালগুলোকে কৃত্রিম বলে ধরে নেওয়া।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু এই মূল বিষয়টিকেই অস্বীকার করেছেন। বর্তমানে এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা মোটামুটি একমত যে মঙ্গলগ্রহের খালগুলোর মধ্যে কোন জ্যামিতিক বিন্যাস নেই, খাল-গুলোর অবস্থান নেহাতই এলোমেলো, নেহাতই অ-সরল ও অনির্দিষ্ট। এমন কি খালগুলো হয়তো অবিচ্ছিন্নও নয়। মনে করা যাক, একটা সাদা কাগজের উপরে ইঞ্চিতে আটটা হিসেবে একসার ফুট্‌কি বসানো হয়েছে। যদি ফুট ত্রিশেক দূর থেকে কাগজটার দিকে তাকানো যায় তাহলে আলাদা আলাদা ফুটকিগুলোকে চেনা

যাবে না—মনে হবে যেন একটানা কালো একটা দাগ। তেমনি মঙ্গলগ্রহের খালগুলোকে যে একটানা মনে হয় তাও হয়তো এমনি দেখার ভুলেই। একথা কেউ অস্বীকার করছে না যে মঙ্গলগ্রহের গায়ে কালো কালো দাগ আছে ; দাগগুলোকে মোটামুটি সরল ও একটানা বলেই মনে হয়। কিন্তু সত্যি সত্যিই সরল ও একটানা কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, যে-দাগগুলোকে আমরা মঙ্গলগ্রহের খাল বলে মনে করছি সেগুলো আসলে মঙ্গলগ্রহের জমিতে ফাটল মাত্র, সেই ফাটল দিয়ে আগ্নেয়-গিরির বাষ্প বেরিয়ে এসে জমিকে সরস করে তোলে আর তখন সেখানে উদ্ভিদ জন্মায় আর এই উদ্ভিদকেই আমরা দেখি।

যাই হোক, এইসব জল্পনা-কল্পনা নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে মঙ্গল-গ্রহের অন্যান্য খবরগুলো যথাসম্ভব সংগ্রহ করে নেওয়া যাক। মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে কিনা—এই বিষয়ে খানিকটা আলোচনা চলতে পারে। মঙ্গলগ্রহ থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৩·২ মাইল। সুতরাং সঙ্গতভাবেই আশা করা যেতে পারে যে মঙ্গল-গ্রহের সবটুকু হাওয়াই মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দিতে পারেনি। তবে একথাও ঠিক যে মঙ্গলগ্রহ যেটুকু হাওয়া আটকে রাখতে পেরেছে তা পৃথিবীর তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

মঙ্গলগ্রহে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার একটা প্রমাণ, মঙ্গলগ্রহের মেরু-প্রদেশের বরফের টুপি। ঋতুতে ঋতুতে এই বরফের টুপির আকার যে পাল্টায় এই ঘটনাই মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মেরুপ্রদেশের টুপি বিশেষ এক ঋতুতে গলে গিয়ে জল হয়ে যায়, আবার বাষ্প হয়ে ফিরে এসে বিশেষ এক ঋতুতে আবার মেরুপ্রদেশে বরফের টুপি পরিয়ে দেয়—বায়ুমণ্ডল না থাকলে এ-ব্যাপারটা কিছুতেই সম্ভব হত না। যদি কোনদিন মঙ্গলগ্রহ সবটুকু হাওয়া খুইয়ে বসে তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই জলের সঞ্চয়টুকুও বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে উবে যাবে। এ-ছাড়া নানাভাবে ফটোগ্রাফ নিয়েও প্রমাণ করা হয়েছে যে মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে।

এবং মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলগ্রহের উপরিতলকে চোখ দিয়ে দেখা যায়। আমরা জানি, চাঁদ ও বুধগ্রহের উপরিতল প্রত্যক্ষ-গোচর—কারণ চাঁদ ও বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই। আর যে-সব গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে—যেমন শুক্র বা মহাকায় গ্রহগুলি—সেখানে গ্রহের উপরিতল সব সময়েই চোখের আড়ালে থেকে যায়। মঙ্গলগ্রহ এদিক থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

এবার দেখা যাক, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল কি কি উপাদানে তৈরি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। অক্‌সিজেন আছে কিনা—তা আজ পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। অনুমান করা চলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে-পরিমাণ অক্‌সিজেন আছে তার হাজার ভাগের এক ভাগ অক্‌সিজেনও মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে নেই। অক্‌সিজেনের অস্তিত্ব পরীক্ষায় ধরা না পড়লেও তার সপক্ষে একটা বিকল্প প্রমাণ হাজির করা যায়। তা হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের লালচে রঙ। মঙ্গলগ্রহের লালচে রঙ হবার কারণ বোধ হয় এই যে মঙ্গলগ্রহের পাথরগুলোর সঙ্গে অক্‌সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে গেছে। লোহার সঙ্গে অক্‌সিজেনের যে ধরনের মিশ্রণ ঘটলে লোহায় মরচে পড়ে—এও হচ্ছে তাই। খুব সম্ভবতঃ মঙ্গলগ্রহের পাথরগুলো এভাবে প্রায় সবটুকু অক্‌সিজেনকেই গিলে বসে আছে এবং কোন দিন আবার যে সেই সব পাথরের মধ্যে থেকে অক্‌সিজেন আবার বেরিয়ে আসতে পারবে সে-সম্ভাবনাও নেই। এই জন্যেই মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেনের এত টানাটানি। আর গভীর জলের মাছের মতো এমন গোপন তাদের চলাফেরা যে হাজার টোপ ফেলেও তাহাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

তেমনি টের পাওয়া যায় না কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাসের অস্তিত্ব। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। কারণ কার্বন ডাই-অক্‌সাইড গ্যাস পরিমাণে অনেকখানি না হলে পৃথিবীর যন্ত্রে সাড়া জাগায় না।

মঙ্গলগ্রহের উত্তাপ বিষুব অঞ্চলে ৫০° ফারেনহিট বা তার কিছু বেশি পর্যন্ত ওঠে। লালচে অঞ্চলগুলোর চেয়েও কালো ছোপের অঞ্চল-গুলোতে উত্তাপ বেশি। আর শীতকালে মেরুপ্রদেশে উত্তাপ নেমে যায়—৭০° সেন্টিগ্রেডে, বা ফারেনহিট স্কেলে হিমাঙ্কেরও ১২৫° নিচে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের আকাশে সূর্য অপরাহ্নের দিকে ঢলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত উত্তাপ কমতে থাকে। তার কারণ, মঙ্গলগ্রহের বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। আর বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকলে দিনের বেলার উত্তপ্ত মাটি রাত্রিবেলার জন্যে উত্তাপের সঞ্চয় ধরে রাখতে পারে না। এই জন্যেই, এমন কি এই পৃথিবীতেও ট্রপিক অঞ্চলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি বলে দিনের বেলার উত্তাপ ও রাত্রিবেলার উত্তাপ প্রায় সমানই থাকে ; কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের অভাবে দিনের উত্তাপে ও রাতের উত্তাপে ভীষণ রকমের তারতম্য থাকে। আর গোটা মঙ্গলগ্রহ এমনি একটা মরুভূমির মতো। সেখানে মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পরের মুহূর্ত থেকেই উত্তাপ কমতে শুরু করে এবং মধ্যরাত্রে নেমে আসে—১৩০° ফারেনহিটে। বা, মঙ্গলগ্রহকে তুলনা করা যেতে পারে পৃথিবীর উচ্চ পার্বত্যদেশের সঙ্গে। সেখানে দিনের বেলা অবাধ সূর্যের আলো, কিন্তু রাত্রিবেলার জন্যে উত্তাপের কোন সঞ্চয়ই থাকে না। আবার দিনের আর রাত্রির উত্তাপে যেমন তারতম্য তেমনি তারতম্য গ্রীষ্মে ও শীতে। মঙ্গলগ্রহের ঋতুর স্থায়িত্ব পৃথিবীর ঋতুর স্থায়িত্বের প্রায় দ্বিগুণ। মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে তখন উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। সুতরাং উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মের গরম ও শীতের ঠাণ্ডা দুই-ই মাত্রাতিরিক্ত।

এই হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে মোটামুটি খবর। এ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্ত করতে পারি ? মঙ্গলগ্রহে কি সত্যি সত্যিই জীবনের অস্তিত্ব

আছে? যে গ্রহে জল আছে, পরিমাণে অল্প হলেও অক্‌সিজেন আছে, দিনের এবং রাত্রের উত্তাপের মধ্যে তারতম্য সত্ত্বেও মোটামুটি সহনীয় উত্তাপ—সেখানে জীবনের অস্তিত্ব না থাকার কোন কারণ নেই। তবে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান জীবনের অস্তিত্ব নেই।

মঙ্গলগ্রহের গায়ে যে-সব দাগ দেখা যায় সেগুলোর রঙ এবং আদল যে ঋতুতে ঋতুতে পাল্‌টায় সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বিশেষ বিশেষ ঋতুতে মঙ্গলগ্রহের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে উদ্ভিদ গজায়। এই উদ্ভিদে ঢাকা অঞ্চলই পৃথিবী থেকে দেখায় কালো ছোপের মতো। সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ঘোষণা থেকে জানা গেছে, তাঁরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়েছেন যে মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ আছে।

তেমনি মঙ্গলগ্রহে যে অক্‌সিজেন আছে, বা এককালে ছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ মঙ্গলগ্রহের লালচে রঙ। যেখানে অক্‌সিজেন আছে, এবং সূর্যের আলো আছে—সেখানে উদ্ভিদও নিশ্চয় থাকবে।

তবে মঙ্গলগ্রহে প্রাণীজগতের অস্তিত্ব আছে কিনা—এ কথাটার জবাব কিন্তু এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে দেওয়া চলে না। সেখানে অক্‌সিজেনের পরিমাণ এত কম যে মানুষের মতো উচ্চতর পর্যায়ের জীব থাকতে পারে না। তবে কোন না কোন ধরনের জীবন থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করেছি তখন দেখা গেছে, সেইসব গ্রহে এমনই আবহাওয়া যে সেখানে জীবনের অস্তিত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সমস্ত সৌরমণ্ডলের মধ্যে একমাত্র মঙ্গলগ্রহের আলোচনায় আসার পরেই আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে—মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। মনে রাখতে হবে, একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই জীবনের আবির্ভাব ঘটে—জীবনের আবির্ভাব কোন ক্রমেই সৃষ্টির একটা বিস্ময় বা দুর্ঘটনা নয়। এই প্রক্রিয়া যেখানেই সম্পূর্ণ হয় সেখানে জীবনের আবির্ভাব ঘটবেই।

তবে একথাও হয়তো বলা চলে, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলগ্রহ এক লুপ্তপ্রায় জীবনের দেশ। এই গ্রহটি তার বায়ুমণ্ডলকে প্রায় খুইয়ে বসেছে, জলের সঞ্চয়ও প্রায় নিঃশেষিত, অক্সিজেনের ভাণ্ডার প্রায় উজাড়—সুতরাং এই গ্রহের যেটুকু জীবন আছে তা মুমূর্ষু। শ্যাওলার মতো যেটুকু উদ্ভিদ আজো সেখানে ঋতুতে ঋতুতে গজিয়ে ওঠে তাও একদিন হয়তো নিঃশেষে মুছে যাবে। তখন আরেকটি মৃতগ্রহের সংখ্যা বাড়বে আমাদের এই সৌরমণ্ডলে।

মনে হতে পারে, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল—এই তিনটি গ্রহের অবস্থান বিবর্তনের তিনটি বিশেষ ধাপে। শুক্র আছে আদিতে, পৃথিবী মধ্যে এবং মঙ্গল অন্তে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর চেহারা ছিল আজকের দিনের শুক্রগ্রহের মতোই—এবং লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর চেহারা আজকের দিনের মঙ্গলগ্রহের মতো হবে কিনা কে জানে!

গ্রহাণুপুঞ্জ-উপগ্রহ-ধূমকেতু

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আছে একতাল ক্ষুদে ক্ষুদে বস্তুপিণ্ড। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, এই গ্রহাণুপুঞ্জ এককালে একটি অখণ্ড গ্রহ ছিল এবং হয়তো কোন এক সময়ে বৃহস্পতিগ্রহের খুব কাছাকাটি এসে যাওয়াতে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। গ্রহগুলির মতো এই গ্রহাণুপুঞ্জও একই ভাবে এবং একই দিক দিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্য থেকে মোটামুটি তেরো কোটি থেকে পঞ্চাশ কোটি মাইলের মধ্যে এই গ্রহাণুপুঞ্জের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের টুকরোগুলো সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৌনে দু-বছর সময় নেয়, সবচেয়ে দূরের টুকরো সময় নেয় সাড়ে তেরো বছর। মাঝামাঝি জায়গার টুকরোগুলোর সময় লাগে মাঝামাঝি।

বুধ ও শুক্রের কোন উপগ্রহ নেই। প্লুটোর আছে কিনা জানা যায় না। বাকি ছ-টি গ্রহেরই উপগ্রহ আছে। আমরা জানি, পৃথিবীর উপগ্রহ হচ্ছে চাঁদ—এবং সংখ্যায় তা একটি। মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ

আছে দুটি, বৃহস্পতির বারোটি, শনির ন-টি, ইউরেনাসের পাঁচটি এবং নেপচুনের দুটি। দেখা গেছে, প্রত্যেকটি উপগ্রহ নিজের নিজের গ্রহের দিকে সব সময়ে একই দিক ফিরিয়ে থাকে—যেমন চাঁদ থাকে পৃথিবীর দিকে। কেন থাকে, তা আমরা আগেই জেনেছি। এই বইয়ের শেষদিকে ছক এঁকে গ্রহ ও উপগ্রহের বিবরণ দেওয়া আছে। এই বিবরণ থেকে দেখা যাবে, বৃহস্পতির সবচেয়ে বড়ো দুটি উপগ্রহ আকারে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো। বৃহস্পতির আরো দুটি উপগ্রহ শনির একটি উপগ্রহ এবং নেপচুনের একটি উপগ্রহ আকারে চাঁদের চেয়েও বড়ো। বলা বাহুল্য, এসব উপগ্রহের কোনটাতেই বায়ুমণ্ডল নেই। প্রত্যেকটি উপগ্রহ চাঁদের মতো মরা।

একমাত্র শনিগ্রহেরই ন-টি উপগ্রহ ছাড়াও আর একটি বাড়তি ব্যাপার আছে। সেটি হচ্ছে একটি বলয়। আসলে একটি না বলে বলা উচিত তিনটি ; গায়ে গায়ে লেগে থাকে বলে মনে হয় যেন একটি। বলয় তিনটি শনিগ্রহকে বেষ্টন করে আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই বলয় তিনটি হচ্ছে কোটি কোটি কণার সমষ্টি। এবং এগুলি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই—শনিগ্রহের চারপাশে ঘুরছে। আবার বাইরের দিকের বলয়ের চক্রবেগ ভিতরের দিকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে এই বলয় তিনটি তৈরি হয়েছে একটি উপগ্রহ থেকে। উপগ্রহটি শনিগ্রহের এত কাছাকাছি চলে গিয়েছিল যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তারপরে কোটি কোটি চূর্ণকণা উপগ্রহের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে মূল গ্রহের চারদিকে। অনুমান করা চলতে পারে, আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদেরও হয়তো একদিন এই দশা হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন এ-প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করা যায় ঃ

> পণ্ডিত বলছেন,—
> বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
> মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
> পৃথিবীর পাঁজরের কাছে

তবে এসব অনেক পরের কথা। আপাতত চাঁদকে নিয়ে আমাদের কবিতা-রচনা অব্যাহত থাকুক।

গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়া সৌরমণ্ডলে বাদ-বাকি যা আছে তা হচ্ছে উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতু। উল্কাপিণ্ডের কথা আগেই বলেছি, ধূমকেতু ব্যাপারটা কী, একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

ধূমকেতু নাম শুনেই একটা দৃশ্য কল্পনা করা চলে। ধোঁয়ার নিশান উড়িয়ে কোন কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে। আসলে কিন্তু ধূমকেতুর ধোঁয়ার নিশান নেই। ধূমকেতু হচ্ছে অসংখ্য ছোট-বড় বস্তুপিণ্ডের এক-একটা তাল। আকারে কোনটা বালুকণার মতো, কোনটা বা সাতমহলা বাড়ির মতো। বস্তুপিণ্ডগুলো একটি কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে জড়াজড়ি করে থাকে ; মাধ্যাকর্ষণের টান নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে দেয় না। আর ধূমকেতু চলেও ভারি কিম্ভূত ছন্দে। একটু যেন একরোখা। সূর্যের দিকে আসবে তো খুবই কাছাকাছি চলে আসবে, আবার ছুট লাগাবে তো চলে যাবে সূর্য থেকে বহুদূরে। আর কখন যে কার এলাকায় ঢুকে পড়ছে আর কোন ঠিকঠিকানা নেই। এজন্যে শাস্তিও কম পেতে হয় না। হয়তো সূর্য বা বৃহস্পতির এত কাছাকাছি চলে আসে যে সূর্য বা বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের টান বস্তুপিণ্ডগুলোকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ফলে হয়তো ধূমকেতু নামটাই ঘুচে যায় চিরকালের জন্যে। ধূমকেতুর চলার রাস্তার চেহারাটা কি-রকম তা একটা উপমা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। প্রায় একটা পটলের মতো। একটা সাদা কাগজের উপর একটা পটল রেখে যদি তার চারপাশ দিয়ে পেনসিলের দাগ টানা যায় তাহলে যে ছবি পাওয়া যাবে—ধূমকেতুর কক্ষপথের চেহারাও মোটামুটি সেই ধরনের। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। সবচেয়ে বিখ্যাত ধূমকেতুটির নাম হচ্ছে হ্যালি-র ধূমকেতু। এই ধূমকেতুটি সূর্যের সাড়ে-পাঁচ কোটি মাইলের মধ্যে এসে পড়ে ; অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথকে ছাড়িয়েও বেশ খানিকটা ভিতরে চলে যায়। আবার দূরের দিকে ছুট দেবার সময়ে চলে যায় নেপচুনেরও কক্ষকে ছাড়িয়ে।

এই মস্ত লম্বা কক্ষপথে একবার ঘুরপাক খেতে ধূমকেতুটির সময় লাগে ৭৫½ বছর। এই ধূমকেতুটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালের ৭ই মে, আবার দেখা যাবে ১৯৮৬ সালে।

সূর্যের খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত কোন ধূমকেতুকেই দেখা যায় না। ধূমকেতুকে খালি চোখে দেখে মনে হয়, ধূমকেতুর নিজস্ব একটা আলো আছে। আসলে কিন্তু ধূমকেতুর আলোর সবটাই সূর্যের কাছ থেকে ধার করা। ধূমকেতুর লম্বা পুচ্ছটিও সূর্যের দৌলতেই। ধূমকেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত ধূমকেতুর লেজ গজায় না। তারপরে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এসে পড়লেই একটা, দুটো এমন কি তিনটে পর্যন্ত লেজ গজায় আর লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই লেজ। এমনও হতে পারে, সেই লেজকে ফুঁড়ে পৃথিবীকে যেতে হচ্ছে। তাতে অজস্র উল্কাপাত হওয়া ছাড়া পৃথিবীর আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সাধারণতঃ নেই।

আসলে উল্কার সঙ্গে ধূমকেতুর খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অধিকাংশ উল্কাই হচ্ছে অতীতের কোন একটা ধূমকেতুর ছিন্নাবশেষ। যেমন বলা যায়, বিয়েলার ধূমকেতুর কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। সেই ধূমকেতুটির ভগ্নাবশেষ পৃথিবীর উপরে উল্কাপাতের ঝলক তুলছে।

মহাবিশ্ব

মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা
এ নিবিড় আলো-অন্ধকার
কোটি ছায়াপথ মায়াপথ
দুর্গম উদয়-অস্তাচল

মেঘহীন অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে যেন কোটি কোটি তারাফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনটা ম্লান, কোনটা উজ্জ্বল। কোন লাল, কোনটা নীল। কোনটা একা, কোনটা সদল। আর এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত মহাকাশ জুড়ে ফুটে রয়েছে চূর্ণ-চূর্ণ আলো দিয়ে তৈরি ছায়াপথ। তাছাড়া দেখা যাবে, আকাশের এক-একটা জায়গায় এমনি চূর্ণ আলোর পোঁচ পড়েছে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে, কোথাও কোথাও অনেকগুলো তারা একসঙ্গে জুটে গিয়ে ঘোঁট পাকাতে চেষ্টা করছে। ক্রমে ক্রমে সেই তারার দঙ্গলের মধ্যে পরিচিত সব চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব পরিচিত চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণ হবে তাদের—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। পরিচিত সব কাহিনীর নায়কদের খুঁজে পাওয়া যাবে তারামণ্ডলের রেখায় রেখায়। আর তখন নামকরণ হবে—সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, ইত্যাদি।

মহাকাশ জুড়ে এমনিভাবে পৃথিবীর টুকরো টুকরো ইতিহাস লেখা হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো গেল কল্পনার দিক; বাইরের মানুষকে ঘরে এনে বসাবার জন্যে কাছের নাম ধরে ডাকা। কিন্তু তার আগে দেখা

দরকার, বাইরের মানুষটি কোন্ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ডাক সত্যি সত্যি তার কানে পৌঁচচ্ছে কিনা।

পৃথিবী থেকে কতদূরে আছে এক-একটি তারা? কোন্ উপায়ে সেই দূরত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে?

যারা জমি জরিপ করে তারা খুব সহজ একটা উপায়ে দূরের জিনিসের দূরত্ব বার করে। দুই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরের জিনিসটিকে পর্যবেক্ষণ করে তারা স্থির করে একবিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে স্থান-পরিবর্তনের দরুন দূরের জিনিসটি কতখানি দিক-পরিবর্তন করেছে। সেই মাপটি যদি জানতে পারা যায় আর দুই নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্ব যদি জানা থাকে—তাহলেই আঁক কষে অনায়াসেই বার করে নেওয়া চলে যে-কোন একটি বিন্দু থেকে দূরের জিনিসটি কতটা দূরে আছে। এই উপায়েই পর্বতের চূড়ায় না উঠেও জানা যেতে পারে পর্বতের চূড়াটি কত উঁচু, শত্রুর কামানের কাছে হাজির না হয়েও বলে দেওয়া যায় কামানটি কত দূরে।

আর ঠিক এই একই নীতি প্রয়োগ করে আকাশের তারার দূরত্বও বার করা চলে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে, দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু পাওয়ার ব্যাপারে। পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকেও যদি কোন তারাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলেও তারাটি কিছুমাত্র দিক পরিবর্তন করে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে, পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যে যতোটা দূরত্ব, তার চেয়েও অনেক বেশি দূরত্ব যদি অতিক্রম করা যায় তবে হয়তো কোন তারার অবস্থানে লক্ষ্যণীয় দিক-পরিবর্তন পাওয়া যেতে পারে।

কক্ষপথে পৃথিবীর বার্ষিক গতির সুযোগ নিয়ে আমরা এমনি দুটি বিন্দু পেতে পারি।

বছরের কোন এক সময়ে পৃথিবী সূর্যের যেদিকে থাকে, ছ-মাস পরে থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে। হিসেব করে দেখা গেছে এই ছ-মাসে পৃথিবী ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল সরে আসতে পারে। এইভাবে পৃথিবীর কক্ষপথের দুই প্রান্তে দুটি বিন্দু পাওয়া যায়—মহাশূন্যে যে দুটি বিন্দুর মাঝখানের দূরত্ব ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল।

মহাশূন্যের এই ছুটি বিন্দু থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় কোন কোন তারা অতি সামান্য দিক-পরিবর্তন করছে। এত সামান্য যে সাধারণ চোখে ধরা যায় না। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইলের এই দূরত্বকে যদি ছু-ইঞ্চির সমান বলে কল্পনা করা যায় তাহলে সবচেয়ে সামনের তারার দূরত্ব হবে চার মাইল। মাত্র ছু-ইঞ্চি পরিমাণ স্থান-পরিবর্তনের ফলে চার মাইল দূরের কোন বস্তু কতটুকু দিক-পরিবর্তন করে? প্রায় কিছুই না। তবুও যেটুকু করে, তা থেকেই বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের কয়েকটি তারার দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারার নাম 'আল্‌ফা-সেণ্টরি'; এইভাবে হিসেব করে দেখা গেছে, পৃথিবী থেকে এই তারাটির দূরত্ব হচ্ছে ২৫ লক্ষ কোটি মাইল।

২৫ লক্ষ কোটি! পুরো সংখ্যাটিকে লিখতে হলে পঁচিশের পরে বারোটি শূন্য বসাতে হবে। সৌরমণ্ডলের দূরত্বের হিসেবে আমরা দেখেছি, সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরের গ্রহটিও মাত্র ৩৬৭ কোটি মাইল দূরে আছে। কিন্তু তারার জগতে এসে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কাছেরটিকেও কম করে লক্ষ-কোটির মর্যাদা দিতে হবে। সুতরাং এইসব বড়ো বড়ো মাপের দূরত্বকে বোঝাবার জন্যে একটা সহজ উপায় বার করা হয়েছে। উপায়টাকে বুঝে নেওয়া যাক। আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এই পৃথিবীকে সাত বারেরও বেশি বার পাক দিতে পারে। প্রতি সেকেণ্ডে আলোর বেগ যদি হয় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, তাহলে হিসেব করে দেখা চলতে পারে পুরো এক বছরে আলো কতটা পথ অতিক্রম করে। ৬-এর পরে বারোটি শূন্য বসলে সংখ্যাটি যা দাঁড়ায়, ততো মাইল পথ অতিক্রম করবে আলো এক বছরে। এই দূরত্বের মাপটিকে বলা হয় আলোক-বর্ষ। সহজ ভাষায় আমরা বলব আলো-বছর। তারার জগতের দূরত্ব এই আলো-বছরে প্রকাশ করা হয়। যেমন, আল্‌ফা-সেণ্টরি তারাটির দূরত্ব হচ্ছে ৪·৩ আলো-বছর। এইভাবে তারার দূরত্ব প্রকাশ করার আরেকটা সুবিধে

হচ্ছে এই যে, দূরত্বটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চট্ করে বুঝে নেওয়া যায় কোন্ তারার কত বছর আগেকার অবস্থানকে আমরা এই মুহূর্তে দেখছি। যেমন, যদি বলা হয়, আল্‌ফা-সেণ্টরির দূরত্ব ৪.৩ মাইল ; তাহলে বুঝতে হবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন আল্‌ফা-সেণ্টরিকে দেখি, সেটা ঠিক তাৎক্ষণিক দেখা নয়—৪.৩ বছর আগেকার আল্‌ফা-সেণ্টরির অবস্থান দেখা।

তারার দূরত্ব বার করার উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। উপরে যে উপায়ের কথা আলোচনা করেছি, সেই উপায়ে সরাসরি সব তারার দূরত্ব বার করা যায় না। যে-সব তারার দূরত্ব ৫০০ আলো-বছরেরও বেশি, তাদের দূরত্ব এই উপায়ে বার করার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে নিশ্চিত কোন ফল পাওয়া যায় না।

সুতরাং দূরের তারার দূরত্ব বার করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা অন্য একটা উপায় বার করেছেন। এই উপায়টি অনেক বেশি নির্ভুল এবং এর প্রয়োগ অনেক বেশি ব্যাপক। গত বিশ বছরে মহাবিশ্ব সম্পর্কে যতো কিছু খবর জানা গেছে তা এই উপায়টির উপর নির্ভর করেই।

কোন্ বাতি কতটা দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে, তার মাপকে বলে ইংরেজিতে কাণ্ডেল-পাওয়ার। তেমনি কোন একটা তারা কতটা দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে, তার মাপটাও বার করা হয় এই কাণ্ডেল-পাওয়ারেই। কিন্তু দেখা গেছে, আকাশের তারার দীপ্তি সব সময়ে সমান থাকে না ; নির্দিষ্ট সময় পরে পরে তারার দীপ্তি বাড়ে কমে। আর এই দীপ্তি বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক-একবার ফুলে ওঠে, আবার কুঁচকে যায়। আমাদের শরীরের ভিতরে হৃৎপিণ্ড যেমন এক-একবার ফুলে ওঠে, আবার কুঁচকে যায় ; তেমনি আকাশের তারার শরীরেও যেন এক হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চলেছে। আমাদের শরীরের হৃৎপিণ্ড প্রসারিত-সঙ্কুচিত হয়ে রক্তের প্রবাহ সৃষ্টি করে ; আকাশের তারার হৃৎপিণ্ড সৃষ্টি করে দীপ্তির প্রবাহ। প্রবাহ না বলে বলা উচিত জোয়ার-ভাটা। জোয়ারের সময় তারার দীপ্তি বেড়ে যায়, ভাটার সময় দীপ্তি কমে। এই জোয়ার ও ভাটা মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ চক্রের

সময়টা যদি হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে-কোন একটি তারার পক্ষে এই সময়ের হিসেবটা সব সময়েই সমান থাকে। সময়ের এই হিসেবটার নাম দেওয়া যাক কালচক্র। সব তারার কালচক্র সমান নয়, এক-একটি তারার এক-এক মাপের। কোন কোন তারার কালচক্র কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কোন কোনটার ত্রিশদিন। এবার প্রত্যেকটি তারার কালচক্র হিসেব করে নিয়ে তাদের কাল-চক্রের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে, তারাগুলোকে কালচক্রের ক্রমানুসারে সাজিয়ে যে সারবন্দী চেহারা পাওয়া যায়, তারাগুলোকে দীপ্তির ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিলেও সেই সারবন্দী লাইনে কোন অদলবদল হয় না। তার মানে তারার কালচক্রের সঙ্গে তারার দীপ্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। কোন স্কুলের ত্রিশজনকে ছেলেকে প্রথমে সাজানো হল কে কতটা লম্বা সেই হিসেবে, তারপর সাজানো হল কার কত বয়স সেই হিসেবে—দু-বারেই যদি সারবন্দী লাইনটা একই রকম থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে, কোন্ ছেলে কতটা লম্বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কোন ছেলের কত বয়স। এটুকু জানার পর, প্রত্যেক ছেলের বয়সের খোঁজ না করলেও চলে, ছেলেটি কতটা লম্বা তা জানতে পারলেই জেনে নেওয়া যায় ছেলেটির বয়স কত। তেমনি আকাশের কোন্ তারার কালচক্রের মাপ কত, তা জানতে পারলেই হিসেব করে বার করে নেওয়া যায় সেই তারার দীপ্তি কতখানি।

এবার মনে করা যাক, কোন একটি সিধে রাস্তায় সার সার বাতি জ্বলছে; প্রত্যেকটি আলোর ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার বা দীপ্তি একই মাপের। এবার যদি কোন একটা জায়গা থেকে সেই আলোর সারির দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, তাহলে কোন্ বাতি কতখানি নিষ্প্রভ হয়েছে তা থেকেই হিসেব করে নেওয়া চলে কোন্ বাতি কতটা দূরে। কিন্তু বাতিগুলোর দীপ্তি যদি একই মাপের না হয়— তাহলে জানতে হবে কোন্ বাতির দীপ্তি কতোখানি। এবার আকাশের

তারাগুলোকে একরাশ বাতি বলে কল্পনা যাক। যদি প্রত্যেকটি বাতির সত্যিকারের দীপ্তির মাপ জানা থাকে, আর পৃথিবীতে পৌঁছতে গিয়ে সেই দীপ্তি কতখানি নিষ্প্রভ হচ্ছে সেটুকু যদি জেনে নিতে পারা যায়—তাহলেই অনায়াসে তারার দূরত্ব বার করে নেওয়া চলে।

যে তারার কালচক্র যতো দীর্ঘ—সে-তারার দীপ্তি বা ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারও ততো বেশি। যেমন, যে তারার কালচক্র দু-দিনে সম্পূর্ণ হয় সে তারার দীপ্তি হবে আমাদের সূর্যের ২৬০ গুণ বেশি। কালচক্র যদি ১০ দিন হয়, তাহলে দীপ্তি হবে সূর্যের ১৭০০ গুণ বেশি। কালচক্র ৩৬ দিন হলে দীপ্তি হবে ৯,৬০০ গুণ। যে কটি দৃষ্টান্ত নেওয়া হল তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারার দীপ্তি সূর্যের চেয়ে বহু গুণ বেশি হচ্ছে। বাস্তবেও দেখা গেছে, অধিকাংশ তারাই সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি দীপ্তিশীল। এইজন্যেই বহু বহু দূরে থাকা সত্বেও এইসব তারাকে পৃথিবী থেকেও দেখা যায়। কিন্তু এতটা দূরত্ব থেকে আমাদের সূর্যের মতো একটা মাঝারি গোছের তারাকে একেবারেই দেখা যাবে না।

আগেই বলেছি, সরাসরি হিসেব করে বড়ো জোর ৫০০ আলো-বছর দূরের তারার দূরত্ব বার করা যায়। কিন্তু এই মহাবিশ্বে ৫০০ আলো-বছর দূরত্বটা কিছুই নয়, তার বাইরেও রয়েছে বিপুল বিরাট বিশ্ব। এই মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির তুলনায় ৫০০ আলো-বছর দূরত্বটা প্রায় আমাদের পাড়ার চৌহদ্দির মধ্যেই পড়ে যায়। তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা করতে হলে উপরে বর্ণিত উপায়ের সাহায্য নিতে হবে।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে যেমন অসংখ্য তারা দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় কোথাও কোথাও যেন খানিকটা চূর্ণ-আলো লেপা রয়েছে। আসলে এই চূর্ণ-আলোর মধ্যে অনেকগুলি তারা আছে। এখন যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে এই চূর্ণ-আলোর মধ্যেকার কোন একটি তারার কালচক্র

হচ্ছে ৩৬ দিন, তাহলে অনায়াসেই বলে দেওয়া চলে যে এই তারাটির দীপ্তি সূর্যের চেয়ে ৯,৬০০ গুণ বেশি এবং পৃথিবী থেকে তারাটির দূরত্ব ৫০,০০০ আলো-বছর। ৫০,০০০ আলো-বছর! পরে আমরা দেখব, মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির তুলনায় ৫০,০০০ আলো-বছর দূরত্বটাও এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। সুতরাং পরবর্তী অংশে এমনি ধরনের দূরত্বের কথা আমাকে সহজভাবেই উল্লেখ করে যেতে হবে। কিন্তু উল্লেখ করা সহজ হলেও কল্পনা করা দুঃসাধ্য। যে আলোর গতি আমাদের এই পৃথিবীকে সেকেণ্ডে সাতবার পাক খেতে পারে— সেই আলো ৫০,০০০ হাজার বছরে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে তার ধারণা আমরা কী করে করব? কল্পনাতীতকে কল্পনা করবার চেষ্টাকে কি ভাষায় রূপ দেওয়া যায়?

কিন্তু ভাষায় যাকে প্রকাশ করা যায় না, তাকে প্রকাশ করা যায় অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে। বৈজ্ঞানিকরা এই মহাবিশ্বকে চুলচেরা ভাগ করে করে কতগুলো অঙ্কের সংখ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। আর এই অঙ্কের সংখ্যাগুলোর মধ্যে মহাবিশ্বের বিশালতার যে রূপটি ফুটে ওঠে তার সামনে নিঃসাড় হয়ে যেতে হয় একেবারে। আক্ষরিক অর্থেই নিঃসাড়। জাগতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনে যে-সব অনুভূতি জাগে—যেমন ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ—তাই নিয়েই বিচার করা হয় ঘটনার গুরুত্বকে। কিন্তু যে ঘটনা মানুষের সমস্ত উপলব্ধির বাইরে তা মানুষের মনে কোন্ অনুভূতি জাগাবে?

অঙ্কের সংখ্যা সাজিয়ে সাজিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এই মহাবিশ্বের যে রূপটিকে প্রকাশ করেছেন তার একটা মোটামুটি বিবরণ উপস্থিত করবার চেষ্টা করছি।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত সারা আকাশ জুড়ে ছায়াপথ ফুটে আছে। কল্পনা করা যেতে পারে যে মস্ত একটা চাকার উপরের অর্ধেকটা আমরা দেখছি। পৃথিবীর দুই গোলার্ধের আকাশকে যদি একসঙ্গে দেখা যেত তাহলে বোঝা যেত যে ছায়াপথটা সত্যি সত্যিই একটা
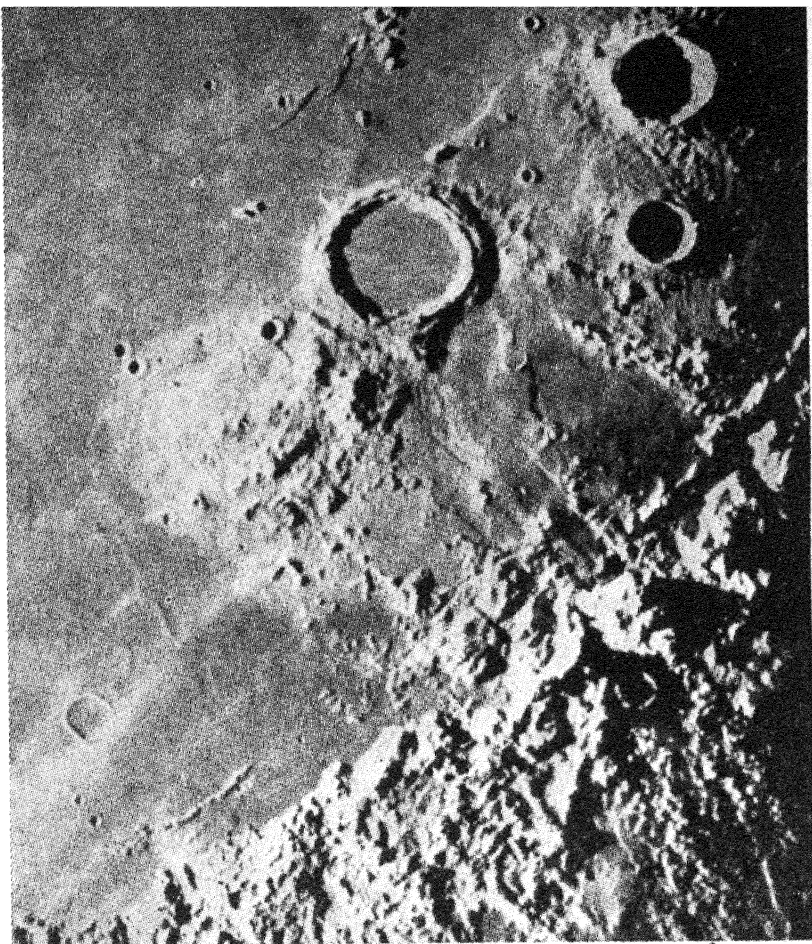
চন্দ্র

যে পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও তা ২১,০০০ ফিট উঁচু। তা ছাড়া আছে গভীর খাদ ও এবড়োখেবড়ো জমি।
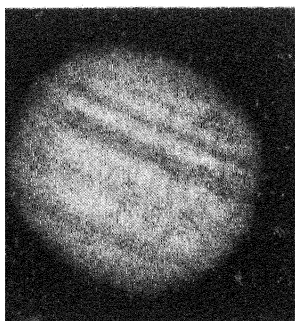
সর্বাঙ্গে কালো দাগ টানা বৃহস্পতিগ্রহ
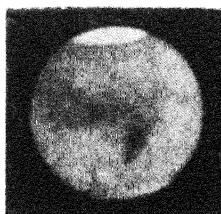
বরফের সাদা টুপি পরা মঙ্গলগ্রহ
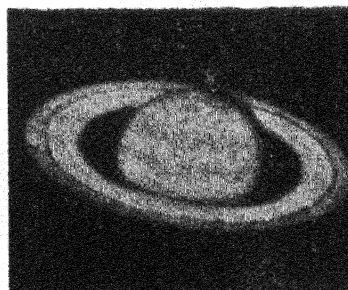
বলয়বেষ্টিত শনিগ্রহ

(উপর)

'আকাশগঙ্গা'

ছায়াপথের একাংশ

দেখা যাচ্ছে অজস্র তারা ও নীহারিকা। তারাগুলি এত দূরে যে সূর্য থেকে বহু গুণ উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও টিমটিম করে। নীহারিকা যেখানে জ্বলন্ত গ্যাসের, সেখানে উজ্জ্বল; যেখানে ধুলোর কণার, সেখানে কালো।

(নীচ)

বহু দূরের একটি ছায়াপথ
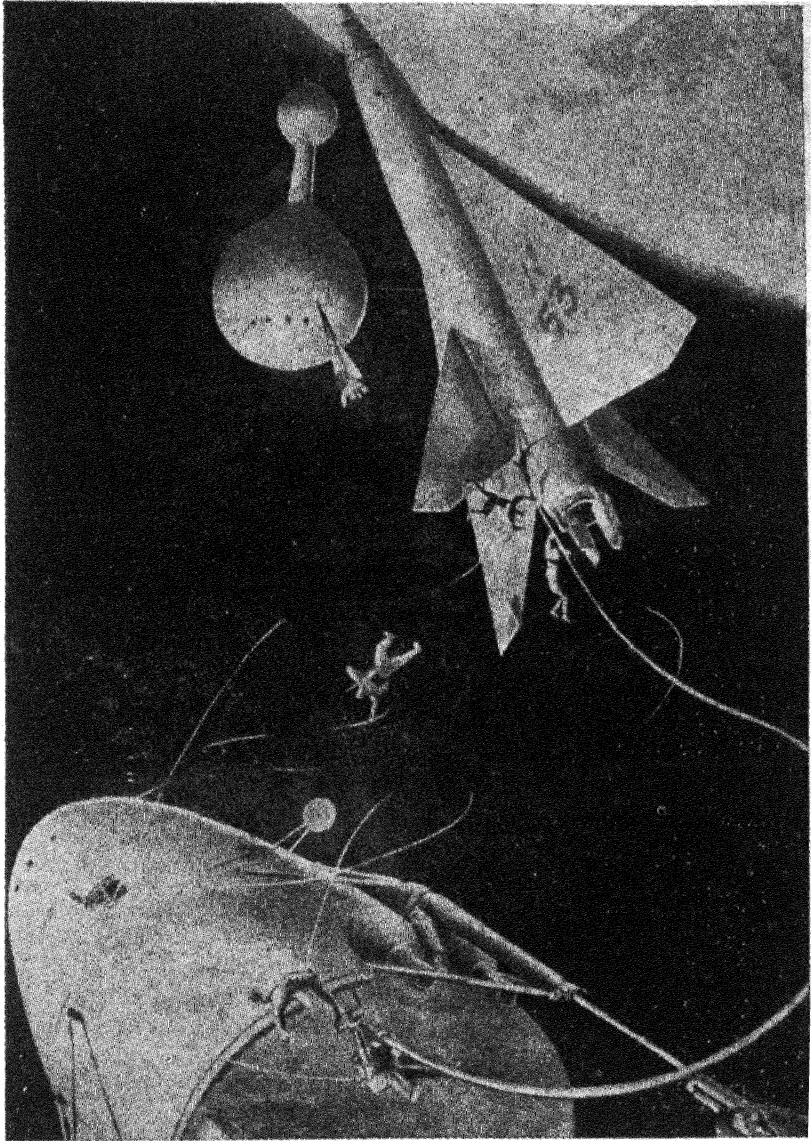
মহাশূন্যের কক্ষপথে সঞ্চরমান অবস্থায় গ্রহান্তরগামী
ব্যোমযানের জ্বালানি সংগ্রহের দৃশ্য।
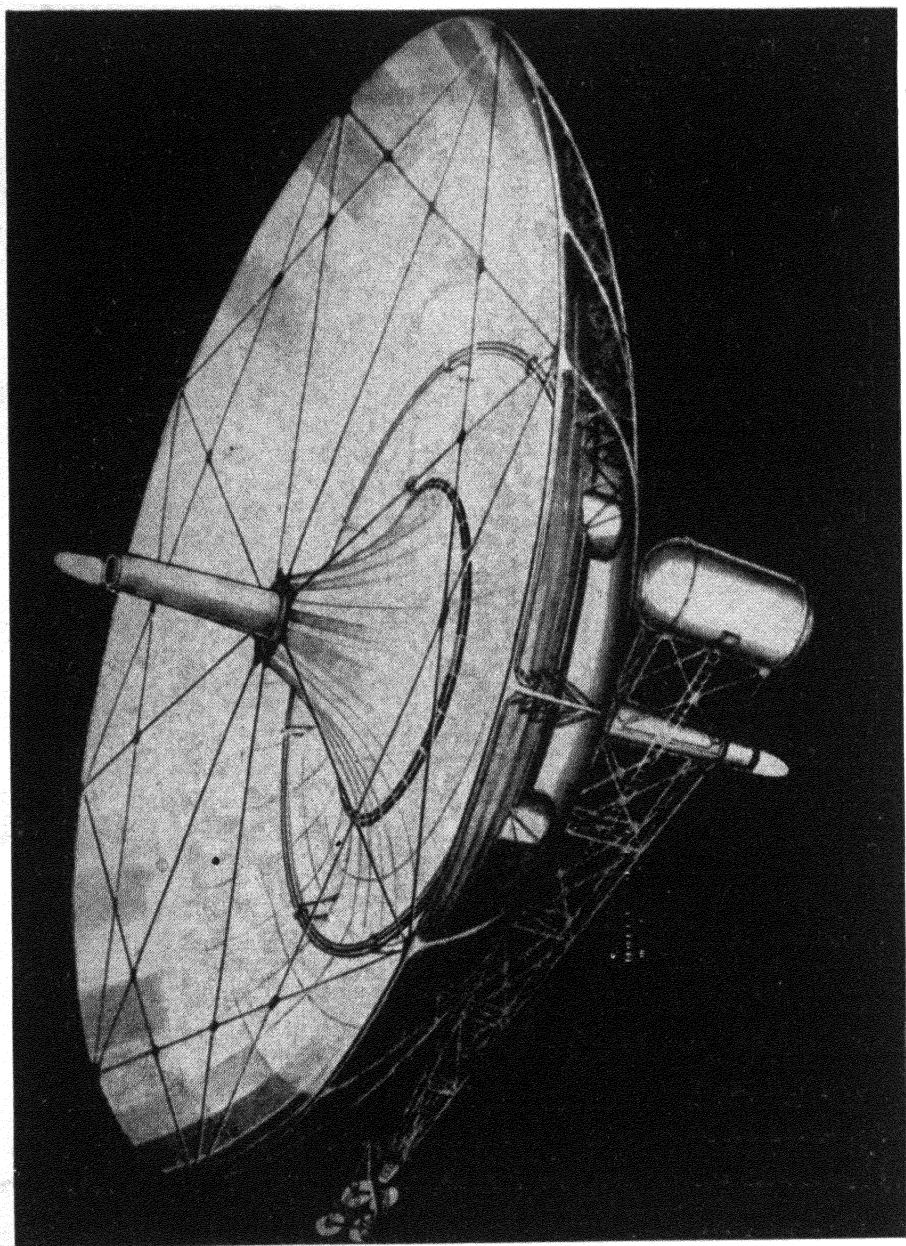
মহাশূন্যের বিরামস্থান
(স্মিথ রস স্পেস-স্টেশন)

চাকার মতো। এই চাকাটা হচ্ছে একটা বিশ্ব। ইংরেজিতে এই বিশ্বের নাম দেওয়া হয়েছে গ্যালাক্সি (galaxy), বাংলায় যে নামটি প্রচলিত আছে তাই ধরে নেওয়া যাক—ছায়াপথ। মহাবিশ্বে এমনি প্রায় ১০ কোটি ছায়াপথের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এবার তাহলে নামকরণে একটু তফাৎ করে নিতে হয়। মহাবিশ্ব হচ্ছে ১০ কোটি বিশ্বের সমষ্টি। প্রত্যেকটি বিশ্ব হচ্ছে এক-একটি চাকার মতো—যেমন একটি চাকাকে আমরা অন্ধকার রাত্রে সারা আকাশ জুড়ে ফুটে থাকতে দেখি। ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) বলতে আমরা এমনি এক-একটি বিশ্ব বা চাকাকে বুঝব। তাহলে আমাদের এই পৃথিবী যে বিশেষ বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ, যে বিশেষ ছায়াপথটিকে আমরা অন্ধকার রাত্রে সারা আকাশ জুড়ে ফুটে থাকতে দেখি—তার একটা বিশেষ নাম থাকা দরকার. ইংরেজিতে এই বিশেষ ছায়াপথটির নাম মিল্কি ওয়ে (milky way), বাংলায় বলা যাক—আকাশগঙ্গা।

পৃথক নামকরণ করলাম বটে কিন্তু আকাশগঙ্গাও আসলে ছায়াপথ ছাড়া কিছু নয়; একটি বিশেষ ছায়াপথ, যে ছায়াপথে আমাদের এই পৃথিবী রয়েছে—একথাটি সব সময়ে মনে রাখতে হবে। এবং এই ছায়াপথটির আকার বিরাট চাকার মতো। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালেই এই বিরাট চাকার অর্ধেকটা দেখা যেতে পারে।

কিন্তু আকাশগঙ্গাকে চাকার সঙ্গে তুলনা করলে শুধুই তার আকার সম্পর্কেই ধারণা হতে পারে, চেহারা সম্পর্কে নয়। চেহারা বুঝতে হলে আকাশগঙ্গাকে তুলনা করতে হবে একটা চ্যাপ্টা পকেট ঘড়ির সঙ্গে বা জাঁতার পাথরের সঙ্গে। অর্থাৎ আকারটা চাকার মতো ঠিকই, কিন্তু সেই চাকার মাঝখানটা আংটির মতো ফাঁকা নয়।

এই ফাঁকটুকু ভরাট হয়ে আছে অসংখ্য তারায়। আমাদের সূর্য যেমন একটি তারা—তেমনি সব তারা। অধিকাংশ তারাই দীপ্তিতে ও আয়তনে আমাদের সূর্যকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়।

তবে ভরাট মানে একেবারে নিরবকাশ ভরাট নয়। পরীক্ষার হলে ছাত্ররা যেমন জায়গা ছেড়ে ছেড়ে বসে—তেমনি আকাশগঙ্গায় তারাগুলোও অনেকটা করে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তবে পরীক্ষার হলে ছাত্ররা সাধারণতঃ বসে সমান সমান ব্যবধানে—কিন্তু আকাশ-গঙ্গার তারারা এ-ব্যাপারে নেহাতই খামখেয়ালী। কোথাও সেগুলো ময়দানের সভার মতো ঘিঞ্জি, কোথাও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের মতো দূরে দূরে ছড়ানো।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্ধকার আকাশে যে চাকাটিকে দেখা যায়—সেটি তাহলে কী? সেটি কি আকাশগঙ্গার বেড়? আর আকাশের দিকে তাকালে তো দেখা যায় যে সারা আকাশ জুড়েই তারা ফুটে আছে—আকাশগঙ্গার চেহারা যদি চ্যাপ্‌টা পকেটঘড়ি বা জাঁতার পাথরের মতোই হবে তাহলে এই উল্‌টনো গামলার মতো আকাশটার সর্বাঙ্গে তারা ফুটে থাকবে কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব ভালোভাবে বুঝতে হলে আকাশগঙ্গার ব্যাপ্তি ও আয়তন সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা ধারণা করে নিতে হবে। আমাদের এই আকাশগঙ্গার আকার হচ্ছে মস্ত একটা চাকার মতো। এই চাকাটির ব্যাস এক লক্ষ আলো-বছর। অর্থাৎ চাকার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার আলো বছর। আমাদের সূর্য আছে চাকার কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে একটি তারাপুঞ্জের প্রায় মাঝখানটিতে। তারাপুঞ্জ মানে অজস্র তারা যেখানে ময়দানের সভার মতো ঘিঞ্জি হয়ে রয়েছে বা দূর থেকে যে-সব জায়গাকে চূর্ণ-আলোর প্রলেপ বলে মনে হয়। ইংরেজিতে এর নাম হচ্ছে স্টার-ক্লাউড (star-cloud) বা বাংলায় আমরা বলতে পারি তারা-মেঘ। আকাশগঙ্গায় সূর্যের এলাকা যতোটা ঘিঞ্জি এমন সর্বত্র নয়। অধিকাংশ এলাকাতেই তারাগুলো বহু দূরে দূরে ছড়ানো।

তবে কোন তারাই নিশ্চল নয়। প্রত্যেকটি তারার নিজস্ব গতি আছে। বিভিন্ন তারার গতি বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকরা আরেকটা

আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন। আকাশগঙ্গার গোটা চাকাটি অনবরত ঘুরছে। তবে গাড়ির চাকা যেভাবে ঘোরে—আকাশগঙ্গার চাকার ঘোরাটা ঠিক সেই ধরনের নয়। গাড়ির চাকা ঘুরবার সময়ে গোটা চাকাটাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে একপাক ঘুরে নেয়। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই একপাক ঘুরবার জন্যে চাকার পরিধির কোন বিন্দু যতো দ্রুত চলে, কেন্দ্রের কাছাকাছি কোন বিন্দু চলে তার চেয়ে অনেক ধীরে। কিন্তু আকাশগঙ্গার চাকার বেলায় ব্যাপারটা ঘটে ঠিক এর উল্‌টো। এই চাকায় যে-তারা পরিধির যতো কাছে সে-চাকা চলে ততো দ্রুত। সৌরমণ্ডলের আলোচনাতেও আমরা দেখেছি, যে গ্রহ সূর্যের যতো কাছে সেই গ্রহ ছোটে ততো জোরে। যেমন, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ ছোটে সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল বেগে, পৃথিবীর বেগ সেকেণ্ডে আঠারো মাইল, নেপচুনের সেকেণ্ডে তিন মাইল। আসলে যেখানেই মাধ্যাকর্ষণের টান আর গতিবেগের ছুট্‌-এ জোড় মেলে—সেখানেই এই নিয়ম কার্যকরী। আকাশগঙ্গার গোটা চাকাটি ঘুরছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। আর যেখানে গোটা একটি চাকা মাধ্যাকর্ষণের টানে ঘুরছে সেখানে সহজেই অনুমান করে নিতে পারা যায় যে মাধ্যাকর্ষণের টানটি রয়েছে চাকার ঠিক কেন্দ্রে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে যেমন সূর্য আছে, তেমনি এই আকাশগঙ্গার চাকার কেন্দ্রেও এক অতিকায় বস্তুপিণ্ড আছে? বৈজ্ঞানিকরা বলেন—তা নেই। আসলে এই চাকার প্রত্যেকটি তারা অন্য প্রত্যেকটি তারাকে টানছে, এইভাবে যেখানে যতো টানাটানি চলেছে তার যোগবিয়োগের মোট ফলটা গিয়ে জড়ো হচ্ছে চাকার কেন্দ্রে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, যেন চাকার কেন্দ্রে রয়েছে মস্ত একটা টান আর এই টানের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে তারাগুলো ছুট দিয়েছে। এখানেও সেই টান আর ছুট। চারদিকের এত টানাটানির মধ্যেও তারাগুলো যে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না বরং দূরে দূরে থেকেই একজন আরেকজনকে সেলাম ঠুকে চরকিপাক খাচ্ছে—তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এই

টান আর ছুটের মধ্যে। যতো বেশি টান ততো বেশি ছুট। এই জন্যে চাকার কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় টানও জোরালো, ছুটও দ্রুত।

এবার আমাদের পৃথিবীর অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখা চলতে পারে। প্রথমে আমাদের কল্পনা করতে হবে এক লক্ষ আলো-বছর ব্যাসের বিরাট একটি ঘূর্ণ্যমান চাকাকে। সেই চাকার কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে নেহাতই মাঝারি আকারের ও মাঝারি দীপ্তির একটি তারা আমাদের এই সূর্য। সূর্যের চারপাশে ঘুরছে ন-টি গ্রহ। আমাদের পৃথিবী সেই নবগ্রহের একটি—মাত্র আট হাজার মাইল তার ব্যাস। এক লক্ষ আলো-বছরের সঙ্গে আট হাজার মাইলের কোন তুলনাই চলতে পারে না। পৃথিবীর তুলনায় এককণা ধুলো যতোটুকু, আকাশগঙ্গার তুলনায় পৃথিবী তার চেয়েও অনেক-অনেক ছোট। আর এই পৃথিবীর মানুষ আমরা—আমরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? সূর্য এবং চন্দ্রকে পর্যন্ত আমরা আকাশের একই উচ্চতায় দেখি। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট আর পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে সাড়ে-চার বছর। তাও এই সবচেয়ে কাছের তারাটি এত নিষ্প্রভ যে তাকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক দূরের তারা লুব্ধক এতবেশি উজ্জ্বল যে মনে হয় আমাদের সৌরমণ্ডলীর গ্রহের পাশেই এই তারাটি রয়েছে। সুতরাং, ধুলোর কণার চেয়েও ছোট আমাদের এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে—পৃথিবীর তুলনায় ধুলোর কণার মতোই আমরা মানুষরা যখন মহাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি—তখন কতোটুকু দেখতে পারি আমরা? কতোটুকু সত্যি সত্যিই দেখি? একটি পোকা যদি কোন ঝাঁকড়া গাছের মাঝডাল থেকে চারদিকে তাকায়—তাহলে তার মনে হতে পারে যে চারদিকে গাছের পাতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। অথচ সত্যি সত্যিই তো তা নয়; গাছটার চেয়েও অনেক

বড়ো এই পৃথিবী। এবার এই উপমাটিকে একটু টেনে নিতে পারলেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে। পোকার তুলনায় গাছটি যতো বড়, পৃথিবীর তুলনায় আকাশগঙ্গা তার চেয়ে অনেক-অনেক বড়ো। সারা গাছটিতে যতোগুলি পাতা আছে, আকাশগঙ্গায় তার চেয়েও অনেক-অনেক বেশি তারা আছে। আবার এই গাছের বাইরেও যেমন রয়েছে এই বিরাট পৃথিবী, সেখানে যেমন আছে আরো অসংখ্য গাছ তেমনি এই আকাশগঙ্গার বিশ্বের বাইরেও রয়েছে মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি—রয়েছে আরো অসংখ্য বিশ্ব। সমুদ্রের মাছকে সমুদ্র যেমন চারদিক থেকে ঘিরে থাকে তেমনি পৃথিবীকে ঘিরে আছে আকাশগঙ্গা। তার আসল চেহারাটা আমরা টের পেয়েছি অঙ্কের সংখ্যা সাজিয়ে—চোখের দৃষ্টি দিয়ে নয়।

তবে চোখের দেখায় একেবারে যে কিছুই টের পাওয়া যায় না তা নয়। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে এমনিতে সারা আকাশের গায়ে বিচ্ছিন্ন সব তারা ফুটে থাকে। কোনটা হয়তো খুব কাছের, কোনটা বা খুব দূরের। কিন্তু সব তারাই আমাদের এই আকাশগঙ্গা-ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আকাশগঙ্গার চক্রটির সমতলে যখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে—তা কেন্দ্রের দিকেই হোক বা পরিধির দিকেই হোক—তখন আমরা বিচ্ছিন্ন একটা-দুটো তারাকে আর দেখি না, দেখি অসংখ্য তারাকে একসঙ্গে। যেমন আকাশে একটি পাখি বিচ্ছিন্নভাবে উড়ে গেলে তাকে দূর থেকে দেখায় কালো একটা বিন্দুর মতো, কিন্তু একঝাঁক পাখি উড়ে গেলে তা আর বিন্দু-সমষ্টি থাকে না—স্পষ্ট একটা আকৃতি ধারণ করে। কখনো তা হয় তীরের একটা ফলার মতো, কখনো চক্রের মতো, কখনো বা একটি সরলরেখার মতো। তেমনি অসংখ্য তারাকে যখন আমরা একই সমতলে দেখি, তখন তা আর আলোর বিন্দুর সমষ্টি থাকে না, একটা চাকার বেড়ের মতো আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে। এই বেড় কোথাও বা একটু ঘন, কোথাও বা একটু পাতলা—কিন্তু তার মধ্যে কোথাও ফাঁক থাকে না। আসলে কিন্তু গোরুর গাড়ির চাকার মতো

আকাশগঙ্গারও স্পষ্ট একটা বেড় আছে তা নয়—কোন ছায়াপথেরই নেই। এটা হয় আমাদের দেখার জন্যে। আমাদের ঘরের কাছের চাঁদকে পর্যন্ত আমরা ঠিক জায়গায় দেখতে পাই না—মনে হয় একই আকাশ-গোলকে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান। অর্থাৎ আমরা যতোদূর পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাই তারও অনেক দূরে রয়েছে এরা; এমন কি ঘরের কাছের চন্দ্র পর্যন্ত। সুতরাং সূর্যের চেয়েও কোটি কোটি গুণ দূরের তারাগুলোকে আমরা যে চূর্ণ-আলো দিয়ে তৈরি চাকার একটা বেড়ের মতো দেখব তা খুবই স্বাভাবিক। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা হয়তো আরো পরিষ্কার হবে। খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালে নীল অরণ্য-রেখা দেখা যায়। মনে হয় আকাশের গায়ে কে যেন এক পোঁচ নীল রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা জানি, ওটা আসলে নীল রঙের পোঁচ নয়—আলাদা আলাদা অনেকগুলো গাছ। আবার সেইসব গাছও যে একই সরলরেখায় আছে তা নয়; কোনটা সামনে, কোনটা পিছনে; কিন্তু দূর থেকে তাকিয়ে দেখার ফলে সামনে-পিছনের ব্যবধান মুছে যায়—সব মিলিয়ে আকাশের গায়ে নীল রঙের একটা পোঁচ ফুটে ওঠে। আকাশগঙ্গার আলাদা আলাদা তারাগুলোও এমনি সামনে-পিছনে ছড়িয়ে আছে—কিন্তু কল্পনাতীত দূরত্বের জন্যে সামনে-পিছনের ব্যবধান টের পাওয়া যায় না।

আকাশগঙ্গার চেহারা সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা সৃষ্টি করবার জন্যে এতক্ষণ ধরে যতো উপমা ব্যবহার করেছি—তার প্রত্যেকটিই যে পুরোপুরি সঠিক হয়েছে তা নয়। যেমন বলেছি, সমুদ্রের মাছকে সমুদ্র যেমন ঘিরে থাকে, তেমনি পৃথিবীকে ঘিরে থাকে আকাশগঙ্গার তারাগুলো। কিন্তু এ থেকে যদি মনে করা হয় যে সমুদ্রের জল যেমন নিশ্ছিদ্র, আকাশগঙ্গার ব্যাপ্তিও তাই—তাহলে উপমাটা ঠিক হবে না। কেন হবে না, তার ব্যাখ্যা দরকার।

অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে আমরা যেমন তারা দেখি, ছায়াপথের বেড় দেখি, তেমনি দেখি নীহারিকা। নীহারিকা হচ্ছে খুব

হাল্‌কা জ্বলন্ত গ্যাস। আকাশের সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে বড়ো নীহারিকাটিকে দেখা যায় কালপুরুষের কোমরবন্ধনীর ঠিক নিচে। অবশ্য খালি চোখে দেখলে এই নীহারিকাটি আবছা এক পোঁচ আলোর মতো মনে হবে। মনে রাখা দরকার নীহারিকার নিজস্ব কোন আলো নেই। নীহারিকার মধ্যে যে-সব তারা আছে তাদের আলোর জন্যেই নীহারিকার উজ্জ্বলতা। কালপুরুষের যে নীহারিকাটির কথা বলছিলাম, তা খালি চোখের দেখায় ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু তার উজ্জ্বল অংশটুকু ছড়িয়ে আছে ছ-লক্ষ কোটি মাইল লম্বা জায়গা জুড়ে। নীহারিকাটির গ্যাসের ঘনত্ব বাতাসের ঘনত্বের দশ-কোটি কোটি ভাগের একভাগ ; অর্থাৎ পৃথিবীতে যন্ত্রের সাহায্যে সবচেয়ে ভালো ভ্যাকুয়াম যা তৈরি করা যেতে পারে তার চেয়েও অনেক কম ঘনত্ব এই নীহারিকার গ্যাসের। কিন্তু তবুও নীহারিকাটি এত প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে আছে যে নীহারিকাটির মোট ভর আমাদের সূর্যের ভরের দশ হাজার গুণ বেশি। নীহারিকাটির মধ্যে একাধিক তারা আছে—এই সব তারার আলো শুষে নিয়েই নীহারিকার পরমাণুগুলো জ্বলে ওঠে।

তবে সব নীহারিকাই জ্বলন্ত গ্যাসের মতো নয়। অন্ধকার নীহারিকাও আছে। আকাশের সবচেয়ে ঘন তারা-মেঘের দিকে তাকালেও দেখা যাবে মাঝে মাঝে এক-একটা কালো সুড়ঙ্গ হাঁ করে আছে। এই কালো সুড়ঙ্গের মধ্যে একটিও তারা নেই। এমনি কালো সুড়ঙ্গ আকাশগঙ্গার সর্বত্র আছে—সংখ্যায় কয়েক-শো হবে। কিন্তু আসলে এগুলো কালো সুড়ঙ্গ নয়—অন্ধকার নীহারিকা। এই সব অন্ধকার নীহারিকা আমাদের চোখের দৃষ্টিকে এমনভাবে আটকে দেয় যে তাদের পিছনদিকার তারাগুলোকে পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই না। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে এই অন্ধকার নীহারিকাগুলো হচ্ছে রেণু রেণু ধুলোর মেঘ। এই ধুলোর মেঘ অতি অনায়াসেই আমাদের দৃষ্টির সামনে নিশ্ছিদ্র আড়াল তোলে।

সারা আকাশগঙ্গায় ছড়িয়ে আছে এমনি দু-ধরনের নীহারিকা—উজ্জ্বল আর অন্ধকার। একটি অতি হাল্‌কা গ্যাস, অপরটি রেণু

রেণু ধুলো। এই দু-ধরনের নীহারিকার অবস্থান কোথাও আলাদা আলাদা, কোথাও আবার পাশাপাশি। নীহারিকা যেখানে হাল্‌কা গ্যাসের রূপ নেয়—সেখানে তা উজ্জ্বল। নীহারিকা যেখানে রেণু রেণু ধুলো—সেখানে তা সমস্ত তারাকে আড়াল করে রাখে। আকাশগঙ্গার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে রেণু রেণু ধুলোর নীহারিকা—ফলে আকাশগঙ্গার অনেকখানিই আমাদের আড়ালে থেকে গেছে।

কল্পনা করা চলতে পারে যে আমাদের এই আকাশগঙ্গার সমস্ত নীহারিকা আর সমস্ত তারার বস্তুপুঞ্জ এককালে ছিল প্রকাণ্ড একতাল গ্যাস। সেই গ্যাস থেকে তৈরি হয়েছে পিণ্ড পিণ্ড তারা ; যেটুকু বস্তুপুঞ্জ এখনো পিণ্ড বাঁধতে পারেনি, এখনো নীহারিকা হয়ে ছড়িয়ে আছে—সেটুকুও তারাগুলোর মাধ্যাকর্ষণের টানে একটু একটু করে জড়ো হচ্ছে তাদের গায়ে। কিন্তু নীহারিকার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণের তুলনায় তারার সংখ্যা এত কম যে প্রক্রিয়াটা শেষ হতে এখনো ঢের বাকি। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, নীহারিকার মোট বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ এখনো আকাশগঙ্গার সমস্ত তারার মোট বস্তুপুঞ্জের পরিমাণের সমান।

আকাশগঙ্গা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা গেছে। কী উপায়ে জানা গেছে সেই ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে শুধু তথ্যগুলো পরিবেশন করা যাক।

আকাশগঙ্গার মোট ভর হচ্ছে আমাদের সূর্যের ভরের ১,৬০,০০০ গুণ বেশি। অর্থাৎ, এই ছায়াপথটিতে যেখানে যতো তারা আছে, যেখানে যতো নীহারিকা আছে, এমন কি এমন কোন তারাও যদি থেকে থাকে যা নিভে গেছে—সব মিলিয়ে ছায়াপথটির মোট ভরের মাপ হচ্ছে এই।

আকাশগঙ্গায় মোট কত তারা আছে তা সঠিক ভাবে বলা চলে না। তবে অনুমান করে চলে যে তারার সংখ্যা অন্তত দশ-হাজার কোটি হবে। সমগ্র ছায়াপথটি যে কী বিপুল তা এই সংখ্যা থেকে হয়তো

বোঝা যেতে পারে। আকাশগঙ্গার কেন্দ্রের চারপাশে একটা পাক দিতে সূর্যের সময় লাগে সাড়ে-বাইশ কোটি বছর। সূর্যের কাছাকাছি অন্য যে-সব তারা আছে সেগুলো গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১৭০ মাইল বেগে ছুটছে।

মনে হতে পারে, যেখানে তারাগুলো এমন প্রচণ্ড গতিতে ছুটোছুটি করছে—সেখানে তাদের মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি লাগে না কেন? আগে বলেছি, আকাশগঙ্গার কোন কোন জায়গায় তারাগুলো ময়দানের সভার মতো ঘিঞ্জি হয়ে আছে। এখানেও উপমাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। চোখের দেখায় যা দেখা যায় সেটুকুই এই উপমার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। আসল কথাটা হচ্ছে এই, ছায়াপথে তারাগুলো এত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যে আমাদের এই আকাশ-গঙ্গাকে বসতিহীন বিশ্ব বললেও একেবারে মিথ্যা বলা হয় না। আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব পচিশ-লক্ষ কোটি মাইল। সুতরাং সূর্য মোটামুটি ফাঁকা জায়গাতেই আছে বলতে হবে। আসলে কিন্তু সূর্য আছে একটা ঘিঞ্জি এলাকাতেই; আকাশগঙ্গার অধিকাংশ জায়গা এর চেয়ে অনেক বেশি ফাঁকা।

এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের নিজস্ব বিশ্বের পরিচয়।

বৈজ্ঞানিকরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে আমাদের এই বিশ্বের বাইরে মহাশূন্যে এমনি আরো কোটি কোটি বিশ্ব আছে। আমাদের এই পৃথিবী থেকে তাকিয়ে দেখলে বাইরের এইসব বিশ্বের চেহারা অনেকটা নীহারিকার মতো দেখায়। কিন্তু সেগুলো যে নীহারিকা নয় তার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকরা পেয়েছেন তাদের আলো বিশ্লেষণ করে। নক্ষত্র থেকে যে-ধরনের আলো আসে, এইসব নীহারিকার আলোও সেই ধরনের।

এই বিশেষ ধরনের নীহারিকাগুলোকে সাধারণতঃ বলা হয় সর্পিল নীহারিকা। সামনা-সামনি তাকালে দেখা যাবে, এই নীহারিকা-গুলোর কেন্দ্রে আছে একটি উজ্জ্বল নিউক্লিয়াস; নিউক্লিয়াসের দুই

বিপরীত বিন্দু থেকে দুটি বাহু বেরিয়েছে এবং সাপের মতো নিউক্লিয়াসের চারদিকে পাক খেয়েছে।

সর্পিল নীহারিকাগুলোর সবকটিকেই পৃথিবী থেকে সামনা-সামনি দেখা যায় না। কয়েকটিকে দেখা যায় ট্যারাভাবে, কয়েকটির তো ধারটুকু দেখা যায় মাত্র। কিন্তু যে নীহারিকাকে যেভাবেই দেখা যাক না কেন—প্রত্যেকটি নীহারিকা হুবহু আমাদের এই আকাশ-গঙ্গার মতোই। প্রত্যেকেরই চেহারা চ্যাপ্টা চাকতির মতো।

সর্পিল নীহারিকাগুলোর মধ্যেও বৈজ্ঞানিকরা বিচ্ছিন্ন তারার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন। এইসব তারার কালচক্র স্থির করে নিয়ে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব হিসাব করে বার করা হয়েছে। দেখা গেছে তারাগুলো আছে লক্ষ লক্ষ আলো-বছর দূরে। সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া চলে যে এই তারাগুলো আমাদের নিজস্ব বিশ্বের বাইরে।

এখন থেকে এই বাইরের বিশ্বগুলোকে সর্পিল নীহারিকা না বলে আমরা বলব ছায়াপথ। আমাদের নিজস্ব বিশ্ব আকাশগঙ্গা যেমন একটি ছায়াপথ, এই বিশ্বগুলোও তাই।

আকারের দিক থেকেও এই ছায়াপথগুলো আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রত্যেকটিরই ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলো-বছর। আবার এই প্রত্যেকটি ছায়াপথই আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের মতো ঘূর্ণ্যমান। বস্তুপুঞ্জের পরিমাণও প্রায় সমান। প্রত্যেকটি ছায়াপথেই আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের মতো তারা-মেঘ আছে, আছে জ্বলন্ত গ্যাসের ও রেণু রেণু ধুলোর মেঘের নীহারিকা। প্রত্যেক ছায়াপথেই একই রকম ভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ধুলোর মেঘের নীহারিকার সমাবেশ অনেকখানি এলাকাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছে।

কিন্তু আমাদের ছায়াপথ থেকে এইসব ছায়াপথের দূরত্ব বার করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানা যায়। বাইরের এই ছায়াপথ-গুলোর প্রত্যেকটিই আমাদের ছায়াপথ থেকে অনবরত দূরে সরে সরে

যাচ্ছে। যে ছায়াপথ যতো বেশি দূরে আছে, সেই ছায়াপথের দূরে সরে যাওয়ার গতিও ততো বেশি। কেউ কেউ এ-ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে: আজকের দিনের এই টুকরো টুকরো বিশ্বগুলো একদিন ছিল একটি অখণ্ড মহাবিশ্ব। কোন কারণে সেই মহাবিশ্বের মধ্যে এক বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে সেই মহাবিশ্ব কোটি কোটি টুকরোয় ভেঙে দিয়ে চতুর্দিকে ছিট্‌কিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যখ্যা ঠিক কি ঠিক নয়, তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটির সাহায্যে মহাবিশ্বের একটা ছবি কল্পনা করে নেওয়া হয়তো সহজ হবে।

কী প্রচণ্ড গতিতে যে এক-একটি ছায়াপথ সরে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন যে দূরবর্তী কোন কোন ছায়াপথ সেকেণ্ডে ২৪,৩০০ মাইল বেগে আরো দূরের দিকে সরে যাচ্ছে।
আবার এই সরে যাওয়ার গতি থেকেই ছায়াপথটির দূরত্ব বার করে নেওয়া চলে। হিসেব করে দেখা গেছে, যে বিশেষ ছায়াপথটি সেকেণ্ডে ২৪,৩০০ মাইল বেগে সরে যায়, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ২৩ কোটি আলো-বছর। অর্থাৎ এই ছায়াপথটি থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে সময় লেগেছে ২৩ কোটি বছর। এই বিরাট দূরত্ব সম্পর্কে কোন রকম ধারণা করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শুধু বলা চলে, আজকে এই মুহূর্তে এই ছায়াপথটির যে আলো আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে ২৩ কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে তখন হয়তো ডায়নোসরদের রাজত্ব চলছে। তারপরে হাজার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী একটু একটু করে বদলে গেছে এবং ২৩ কোটি বছর পরে আমরা সেই আদিম কালের ছায়াপথটিকে দেখতে পাচ্ছি।
সবচেয়ে দূরের যে-সব ছায়াপথের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব ৫০ কোটি আলো-বছর। অর্থাৎ, ৫০

কোটি আলো-বছর ব্যাসার্ধের একটি গোলককে যদি কল্পনা করা যায়—তাহলে সেই গোলকটি হবে আমাদের মহাবিশ্ব ; ১০ কোটি বিশ্ব ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে সেই মহাবিশ্বে ; এক বিশ্ব থেকে অপর বিশ্বের দূরত্ব কোটি কোটি আলো-বছর। আর এই দশ কোটি বিশ্ব মহাশূন্যে মোটামুটি সমানভাবে ছড়িয়ে আছে।

এবার তাহলে মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ চিত্রটি খুব সংক্ষেপে আরেকবার বিবৃত করা যাক। আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে একটি মাঝারি আকারের গ্রহ। পৃথিবীকে নিয়ে ছোট-বড়ো নয়টি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আবার সূর্য হচ্ছে একটি মাঝারি গোছের তারা। সূর্যের মতো দশ-হাজার কোটি তারা নিয়ে হয়েছে চাকতির মতো আকারের ঘূর্ণ্যমান একটি ছায়াপথ বা একটি বিশ্ব। এমনি চাকতির মতো আকারের দশ কোটি ছায়াপথ বা দশ কোটি বিশ্ব নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব। এক-একটি ছায়াপথ বা এক-একটি বিশ্বের ব্যাস হচ্ছে এক লক্ষ আলো-বছর। আমাদের সূর্য আছে আমাদের বিশ্বের কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে। ছুটি পাশাপাশি বিশ্বের মাঝখানকার দূরত্ব কোটি কোটি আলো-বছর। মোটামুটি সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে থেকে এই দশ কোটি বিশ্ব প্রায় ১০০ কোটি আলো-বছর ব্যাসের গোলক-পরিমাণ স্থান জুড়ে আছে।

এই হচ্ছে আমাদের বিপুল মহাবিশ্বের ছবি।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

বিশ্বামিত্র মুনি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেবতারা বাধা দেওয়াতে ত্রিশঙ্কুকে ঝুলে থাকতে হয়েছিল স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে। রামায়ণের এই কাহিনীতে আর কোন জটিলতা নেই। সেখানে ত্রিশঙ্কুকে আকাশের দিকে ঠেলা মেরেছিল বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যার জোর। সেই ঠেলার মাপ কত ছিল, ঘণ্টায় কত হাজার মাইল বেগে ত্রিশঙ্কু উর্ধ্বগামী হয়েছিল, এবং পৃথিবী ছাড়িয়ে কতটা উপরে উঠে আসতে পেরেছিল এবং তারপর সে ঘণ্টায় কত হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেয়েছিল—এসব খবর রামায়ণের কাহিনীর পক্ষে অবান্তর।

কিন্তু আধুনিক যুগে গ্রহান্তরে যাতায়াত করবার কথা ভাবতে গিয়ে মানুষ দেখছে, এই পৃথিবীর বাঁধনকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়াই একটা জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। প্রথমতঃ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির টানকে অগ্রাহ্য করবার মতো প্রচণ্ড একটা গতিবেগের ছুট তৈরি করতে হবে। আমরা জানি, সেকেণ্ডে অন্তত সাত মাইল বেগে ছুট দিতে না পারলে কোন বস্তু পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না। আবার সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিবেগের ছুট তৈরি হবার পথে মস্ত একটা বাধা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। আমরা জানি, বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমাদের এই পৃথিবীতে এত রঙের বৈচিত্র্য ;

আবার এই বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমরা নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি, মহাকাশের উল্কাপাত আমাদের স্পর্শ করতে পারে না, বেগুনি-পারের আলো বা মহাজাগতিক রশ্মি বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এমন যে মায়ের আঁচলের মতো বায়ুমণ্ডল তা-ই আবার মহাশূন্যে পাড়ি দেবার বেলায় একেবারে গোড়ার ধাপেই দেখা দেয় মস্ত একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে। বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ গতিকে ব্যাহত করে। আবার বায়ু-মণ্ডলের এই প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই মহাশূন্যে থেকে ফিরতি-পথে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ; প্যারাস্যুটের সাহায্যে বৈমানিকরা যে-ভাবে আকাশ থেকে নেমে আসে। যাই হোক, ফিরে আসার ব্যাপারটা পরে আলোচনা করা যাবে। আপাতত দেখা যাক, মহাশূন্যে রওনা হতে হলে কি কি খবর জানা দরকার আর কি কি আয়োজন চাই।

প্রথমেই জানা দরকার আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের খবর।

আমরা সকলেই জানি বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ আছে। যতো উপরের দিকে ওঠা যায় ততো এই চাপ কমে। এত দ্রুত কমে যে মাইল পাঁচেক উঁচু এভারেস্ট শৃঙ্গে অভিযান করতে হলেও অভিযানের শেষ পর্বের জন্যে বাড়তি বায়ুর যোগান নিয়ে যেতে হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সমুদ্রের সমতলে বায়ুমণ্ডলের যে চাপ আছে, যাকে বলা যায় জীবনধারণের পক্ষে স্বাভাবিক চাপ, তার অর্ধেক চাপের উচ্চতাতেও মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বায়ুর চাপ কমে গেলে মানুষের শরীর পঙ্গু হয়ে যায়। মাটি থেকে মাত্র তিন মাইল সাড়ে-তিন মাইল উচ্চতা পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে—তাও দীর্ঘ অভ্যাসের পরে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সবটাই মাটির কাছাকাছি জায়গাতেই ভিড় করে আছে। যেমন সমুদ্রযাত্রার পরে জাহাজ যখন বন্দরে ফিরে আসে তখন অধিকাংশ যাত্রীই জড়ো হয় পাড়ের দিকের ডেকে ; অন্য দিকটা থাকে প্রায় ফাঁকা। এরোপ্লেনে চেপে দশ মাইল, বড়ো জোর পনের মাইল পর্যন্ত ওঠা যেতে পারে। তার

পরে বাতাস এত পাতলা যে এরোপ্লেনের পক্ষে ভেসে থাকা সম্ভব নয়। বেলুন অবশ্য তার চেয়েও উঁচুতে উঠতে পারে। বেলুনে চেপে মানুষ মাইল পঁচিশেক পর্যন্ত উঠেছে। আর খুব হাল্‌কা যন্ত্রপাতি-সমেত বেলুনকে মাইল ত্রিশেক পর্যন্ত ওঠানো গেছে। তার বাইরে বেলুনও অচল।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বুই ভাগ অংশই জড়ো হয়ে আছে মাটির কাছাকাছি দশ মাইলের মধ্যে। কুড়ি মাইলের মধ্যে আছে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ অংশ। বায়ুমণ্ডলের চাপের দিক থেকে যদি হিসেব করা যায় তাহলে দশ মাইল উপরে উঠলে বায়ুমণ্ডলের চাপ হবে মাটির কাছের চাপের দশ ভাগের একভাগ, কুড়ি মাইল উপরে উঠলে হবে একশো ভাগের একভাগ। যতো উপরের দিকে ওঠা যাবে ততোই বায়ুর চাপ কমবে। সত্তর মাইল উপরে উঠলে বায়ুর চাপ হবে দশ লাখ ভাগের এক ভাগ। এইভাবে উপরে উঠতে উঠতে ১২০ মাইল ছাড়িয়ে যাবার পর বায়ুমণ্ডলের আর বিশেষ কোন অস্তিত্ব থাকে না।

এখানে একটা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া দরকার। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশেষ এক উচ্চতায় পৌঁছে আচমকা শেষ হয়ে যায় না। বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার যেমন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়—বায়ুমণ্ডলের মিলিয়ে যাওয়াটাও তেমনি। আবার মানুষের জীবনে উচ্চস্তরের হাল্‌কা বায়ুমণ্ডলেরও বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে মাইল পঞ্চাশেক উপরে উঠলে দেখা যাবে, সেখানকার হাল্‌কা বাতাস স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, আয়নিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ-উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকরা এর নাম দিয়েছেন বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তর। এই স্তর থেকেই পৃথিবী থেকে পাঠানো ছোট ঢেউয়ের বেতারবার্তা ঠিকরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। আবার এই স্তরে ধাক্কা খেয়েই মহাশূন্য থেকে ছুটে আসা উল্কায় আগুন ধরে। যাই হোক, আমাদের পক্ষে যে খবরটুকু বিশেষভাবে জানা দরকার তা হচ্ছে এই যে,

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে অন্তত প্রথম ১২০ মাইল বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে বেরোতে হবে।

কিন্তু তাই বলে যেন মনে না করা হয় যে এই ১২০ মাইল পেরিয়ে আসতে পারলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানও থাকবে না বা অনেক কমে যাবে। দেখা গেছে, আড়াই-শো মাইল উঁচুতে উঠতে পারলেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের শতকরা প্রায় নব্বুই ভাগই অটুট থেকে যায়। পৃথিবী ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা যেতে না পারলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান বেশ খানিকটা কমে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর মাটিতে যে জিনিসের ওজন এক সের, পৃথিবী ছাড়িয়ে বারো হাজার মাইল যেতে পারলে সেই একই জিনিসের ওজন হবে এক ছটাক। পৃথিবীর মাটিতে যে জিনিসের ওজন সাতাশ মন, পৃথিবী ছাড়িয়ে ষাট হাজার মাইল যেতে পারলে সেই একই জিনিসের ওজন হবে পাঁচ সের; প্রায় দু-লক্ষ মাইল উঁচুতে হবে আধ সের। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, পৃথিবী ছাড়িয়ে যতো দূরে যাওয়া যাবে, ততোই কোন জিনিসের পক্ষে আরো দূরে যাওয়াটা সহজ হবে। কল্পনা করা চলতে পারে, একটা মোটরগাড়ি উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় উঠবার চেষ্টা করছে। পাহাড়ের তলার দিকটা একেবারে খাড়াই, যতো উপরের দিকে ওঠা যাচ্ছে ততোই পাহাড় ঢালু হয়ে আসছে, শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চুড়োয় উঠে একেবারে সমতল। মাধ্যাকর্ষণের টানের বেলায় কিন্তু একেবারে সমতলে কোন সময়েই পেঁছিনো যায় না। সঠিকভাবে বলতে গেলে, মহাবিশ্বে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পৃথিবীর টান পেঁ ৗচচ্ছে না। এক অদৃশ্য টানাটানির সুতোয় এই মহাবিশ্ব বাঁধা রয়েছে। সেখানে প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে টানে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে, পৃথিবী ছাড়িয়ে কয়েক লক্ষ মাইল চলে আসার পরে পৃথিবীর টান এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় যে তাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে।

আবার মহাশূন্যের এমন জায়গাতেও পেঁছিনো যেতে পারে যেখানে

পৃথিবীর টান এবং অন্য কোন বস্তুপিণ্ডের টান কাটাকুটি হয়ে এক ত্রিশঙ্কুরাজ্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ টানাটানিটা ঠিকই আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ; যেমন দড়ি-টানাটানির বেলায় দু-দিকের টান সমান হয়ে গেলে দড়ি কোনদিকেই নড়াচড়া করে না। আবার পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এলাকাতেও এমনি একটি ত্রিশঙ্কুরাজ্য সৃষ্টি করে নেওয়া যেতে পারে। কোন বস্তু যদি এমন একটি বেগ নিয়ে ছুট দিতে পারে যার জোর পৃথিবীর টানের জোরের সমান—তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর চারদিকে একই কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে এবং অনন্তকাল ধরে এমনি ভাবে পাক খেতে থাকবে,—যেমন নাকি সূর্যের চারদিকে পৃথিবী পাক খাচ্ছে। এক্ষেত্রেও মনে হতে পারে, যেহেতু ঘূর্ণ্যমান বস্তুটি পৃথিবীর টানে নেমে আসছে না, অতএব বস্তুটির উপরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কার্যকরী নয়। আসলে কিন্তু টানটা ঠিকই আছে, তবে টানের উল্‌টো দিকে এমন একটা ছুট তৈরি করা হয়েছে যার ফলে বস্তুটির উপরে পৃথিবীর টান থাকার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারছে না।

বিষয়টিকে আরেকটু তলিয়ে বোঝা যাক। পৃথিবীর মাটিতে যখন আমরা থাকি তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের অনুভব করে চলতে হয়। আমাদের চলাফেরা, শোয়াবসা, খাওয়াদাওয়া—প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারছে কারণ আমাদের শরীরের উপরে পৃথিবীর প্রচণ্ড একটা টান আছে। এই টান না থাকলে একঢোঁক জল খাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে রীতিমতো একটা কসরতের ব্যাপার হয়ে উঠত। আমাদের শরীরের যে একটা ওজন বা ভার আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের শরীরের উপরে পৃথিবীর টানের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, পৃথিবীর টান আমাদের শরীরের উপর কার্যকরী হতে পেরেছে বা আমাদের শরীরের ভার আছে, তার কারণ পৃথিবীর টানে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে যেতে পারছি না, পৃথিবীর মাটি আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। যেমন স্রোতের টানে ভেসে চললে

স্রোতের ধাক্কা লাগে না, স্রোতের ধাক্কাকে টের পেতে হলে খুঁটি নিয়ে দাঁড়াতে হয়।

কল্পনা করা যাক, কোন একজন লোক অনেক উঁচু থেকে শূন্যে লাফ দিয়েছে। আমরা জানি, পায়ের তলায় কোন অবলম্বন না থাকার জন্যে পৃথিবীর টানে লোকটি মাটির দিকে নামতে শুরু করবে। এই নেমে আসার সময়টুকুতে, অর্থাৎ মাটিতে আছড়ে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টকুতে, লোকটির মনে হবে তার শরীরের কোন ভার নেই। মাটির দিকে পড়তে পড়তে যদি সে এক ঢোঁক জল খেতে চেষ্টা করে তবে সেটা খুব সহজসাধ্য কাজ হবে না। এমন কি লিফ্টে চড়ে উপরের তলা থেকে নিচের তলায় নেমে আসার সময়েও বোঝা যায়, শরীরের ভার যেন একটু কমে গেছে। কিন্তু যেহেতু লিফ্ট-এর নেমে আসাটা পৃথিবীর টানে অবাধ নেমে আসা নয়, যান্ত্রিক উপায়ে লিফ্ট-এর নেমে আসাটাকে শ্লথ করা হয়েছে, সুতরাং শরীরের ভারও পুরোপুরি চলে যায় না।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কোন বস্তু যদি পৃথিবীর টানে অবাধে নেমে আসতে পারে তাহলে সেই বস্তুটির কোন ভার থাকে না। বস্তুটির অবাধ নেমে আসাটা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বস্তুটি ভারশূন্য। অর্থাৎ, পৃথিবীর টান সেই একই রকম থেকে যাচ্ছে, কিন্তু এমন একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে যে পৃথিবীর টানের প্রত্যক্ষ ফল যে বস্তুর ভার সৃষ্টি হওয়া—তা নেই।

আবার অন্যভাবেও পৃথিবীর দিকে অবাধে নেমে আসার অবস্থা, বা ভারশূন্য অবস্থা, সৃষ্টি করা যায়। কোন বস্তুর গতিবেগ যদি এমন হয় যে বস্তুটি পৃথিবীর টানে সরাসরি নিচের দিকে না নেমে কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে শুরু করে—তাহলেও বলা যায় যে বস্তুটি যেন অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর দিকে অবাধে নেমে আসছে। বা, বস্তুটি ভারশূন্য হয়ে গেছে। আমরা জানি, এ-ব্যাপারটা তখনই সম্ভব হয় যখন ছোটার জোর সমান হয় টানের জোরের। যেমন, পৃথিবীর ছোটার জোর সূর্যের টানের জোরের সমান। বা, অন্য

ভাষায় বলা চলে, পৃথিবী অনন্তকাল ধরে সূর্যের টানে অবাধে সূর্যের দিকে নেমে চলেছে।

কথায় কথায় আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যতো আলোচনা করা যায় ততোই ভালো। সিগ্‌নালের লালবাতি বা সবুজবাতি যেমন ট্রেন-চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি মহাশূন্যের চলাফেরার রাস্তাতেও রয়েছে ছুটিমাত্র সিগ্‌নাল—টান আর ছুট। মহাশূন্যে যদি নিরাপদে যাতায়াত করতে হয় তাহলে এই টান আর ছুট সম্পর্কে সব সময়ে সজাগ থাকতে হবে। যেমন কল্পনা করা যাক, শুক্রগ্রহে আমাদের রকেট নামবার চেষ্টা করছে। কি ভাবে আমরা নামব? যদি আমাদের রকেট সরাসরি এসে শুক্রের হাওয়ার সঙ্গে ধাক্কা খায়, তাহলে উল্কাপাতের মতো আমাদের রকেটেও আগুন জ্বলে উঠবে। যদি এই বিপদকে এড়িয়ে চলতে হয় তাহলে সেই টান আর ছুটের ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে। শুক্রগ্রহের টানকে আমরা খুশিমতো বাড়াতে বা কমাতে পারি না, আমাদের হাতে থাকে শুধু ছুট। এই ছুটকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে আমরা আমাদের অবতরণকে নিরাপদ করে তুলতে পারি। শুক্রগ্রহের কাছাকাছি এসে আমাদের রকেটের ছুটকে এমন একটা মাপে নিশ্চয়ই নিয়ে আসা চলে এবং রকেটের গতিমুখকে নিশ্চয়ই এমন ভাবে বদলে দেওয়া যায় যে আমাদের রকেট উপগ্রহের মতো শুক্রগ্রহের চারদিকে একই কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করবে—যেমন পৃথিবীর চারদিকে পাক খাচ্ছে চাঁদ। সেই অবস্থাকে যদি চলতে দেওয়া হয় তবে আমাদের রকেট অনন্তকাল ধরে অবাধে শুক্রগ্রহের দিকে নেমে চলবে। কিন্তু যদি এই অবস্থা চলতে না দিয়ে আমাদের রকেটের ছুটকে আরেকটু কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে আমাদের রকেট শুক্রগ্রহের দিকে আরেকটু নেমে আসবে। এইভাবে রকেটকে একটু একটু করে নামিয়ে শেষকালে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা যায় যে শুক্রগ্রহের হাওয়াকে আমাদের রকেট স্পর্শ

করবে। আর হাওয়ার রাজ্যে একবার পৌঁছতে পারলে প্যারাস্যুটের সাহায্যে বা গ্লাইডারের মতো ভাসতে ভাসতে মাটিতে নেমে আসাটা সহজ ব্যাপার। বিষয়টি নিয়ে পরে আবার আমাদের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে হবে। এখানে শুধু টান আর ছুটের ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া হল। তাহলে, এতক্ষণকার এতসব কথার মধ্যে আমাদের মূল বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে এই : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু অন্য প্রতিটি বস্তুকে টান মারছে ; এই টান সর্বব্যাপ্ত— এই টানকে কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায় ; আর নিষ্ক্রিয় করবার উপায় হচ্ছে ছুট, টানের জোরের সমান জোরের ছুট। বস্তুর টানাটানিতে তখনই ভার সৃষ্টি হয় যখন টানাটানির ফলে যে অবাধগতি সৃষ্টি হবার কথা তা হয় বাধাপ্রাপ্ত। আবার বস্তুকে ভারশূন্য করবার উপায় হচ্ছে দুটি। একটি হচ্ছে, বেশি জোরের টানের বস্তুর দিকে কম জোরের টানের বস্তুকে অবাধে চলে আসতে দেওয়া ; অপর উপায়, কম জোরের টানের বস্তুকে এমন একটা মাপে ছুট দেওয়ানো যে কম জোরের টানের বস্তুটি বেশি জোরের টানের বস্তুর দিকে চলে না এসেও মোটামুটি সমান দূরত্ব বজায় রেখে পাক খেতে শুরু করে। দুটি উপায়ের মধ্যে মিল হচ্ছে এই যে দুটিই আসলে অবাধ চলা ; গতি কোথাও বাধা পাচ্ছে না ; আর যেখানে বাধা নেই সেখানে ভারও নেই।

আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে কি কি আয়োজন চাই, এবার তা সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে।

(১) প্রথমেই দরকার প্রচণ্ড একটা ছুট তৈরি করা। এরোপ্লেন বা বেলুনের সাহায্য নেওয়া চলবে না কারণ এই দু-ধরনের ব্যোমযানই বায়ুমণ্ডলের বাইরে অচল। সুতরাং এমন একটি বিশেষ ধরনের ব্যোমযান তৈরি করতে হবে যার ছুট তৈরি করবার জন্যে বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন হয় না।

(২) দ্বিতীয়তঃ এই ছুটের মাপ এমন হবে যেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের

টানকে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর টানের জোরের চেয়েও এই ছুটের জোর হবে বেশি।
বায়ুমণ্ডল ছাড়াও ছুট দিতে পারে এবং পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা রাখে এমন একটি ব্যোমযানের সন্ধান আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। এই ব্যোমযানটির নাম হচ্ছে—রকেট।

রকেট

রকেটের ছুট কি-ভাবে তৈরি হয় সেটা প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার। সবচেয়ে সহজ এবং চলতি দৃষ্টান্ত যেটা প্রচলিত আছে তাই ধরা যাক। বন্দুক থেকে যখন গুলি ছোটে তখন বন্দুকের বাঁট কাঁধে ধাক্কা মারে। ইংরেজিতে একে বলা হয় বন্দুকের 'কিক' বা লাথি। অর্থাৎ যেন বন্দুকের গুলি সামনের দিকে ছুটে যাবার সময়ে পিছনদিকে লাথি মেরে যাচ্ছে। 'ডেস্টিনেশন মূন' ফিল্ম্-এর একটি দৃশ্য হয়তো অনেকেরই মনে আছে। রকেটের ছুট কি-ভাবে তৈরি হবে সেটা বোঝাবার জন্যে ফিল্ম্-এ দেখানো হয়েছে যে মিকি-মাউস শূন্যে থেকে মাটির দিকে তাক করে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ছে। যতোবার সে গুলি ছোঁড়ে ততোবার বন্দুক তাকে পিছনদিকে লাথি মারে। আর যতোই লাথি খায় ততোই সে শূন্যে ওঠে। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক মাটির দিকে তাক করে শূন্যে ঝোলানো আছে এবং সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক থেকে একসঙ্গে মাটির দিকে গুলি ছুটছে—তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক শূন্যের দিকে যে লাথি মারবে তার প্রচণ্ডতা অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া চলে। রকেটের ছুট এইভাবেই তৈরি হয়। অবশ্য সত্যিকারের বন্দুক ও গুলি রকেটে থাকে না—সে-জায়গায় প্রচণ্ড একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় আর বস্তু-কণাগুলো বন্দুকের গুলির মতোই ছুটে বেরিয়ে আসে। আর যেদিকে বস্তুকণাগুলো ছুটে বেরিয়ে যায় তার উল্টোদিকে থাকে প্রচণ্ড একটা লাথি—এই লাথির ঠেলাতেই রকেট শূন্যে ছুট দেয়।

এই লাথিটা কোত্থেকে আসে সেটা এবার বোঝা দরকার।

আবার একটা চলতি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। রাস্তা দিয়ে যখন আমরা হাঁটি তখন আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যায় কেন? প্রশ্নটা শুনে হাসি আসতে পারে—কিন্তু তবুও ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝা দরকার। ভাত খেলে যেমন পেট ভরে, পা ফেললে তেমনি শরীর এগিয়ে যায়—এত সহজ ব্যাখ্যা নয়। আমরা যখন হাঁটবার জন্যে পা ফেলি, তখন আসলে পা দিয়ে মাটির উপরে চাপ দিই। কোন্ দিকে চাপ দিই? পিছনের দিকে। পিছনদিকে চাপ দেবার জন্যে আমাদের শরীর সামনের দিকে এগিয়ে যাবে কেন? এ-প্রশ্নের জবাব ভাত খাওয়ার মতো সহজ নয়। ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিউটন ছোট্ট একটি সূত্রের সাহায্যে। সূত্রটি হচ্ছে: ক্রিয়া থাকলেই প্রতিক্রিয়া থাকবে—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। পা দিয়ে মাটির উপরে পিছনদিকে চাপ দেওয়াটা একটা ক্রিয়া। সুতরাং এই ক্রিয়ার সমান মাপের এবং বিপরীত দিকের একটি প্রতিক্রিয়াকেও অবশ্যই থাকতে হবে। ফলে, পা দিয়ে মাটির উপরে পিছনদিকে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিও সমান জোরে সামনের দিকে ঠেলা মারে। এই ঠেলার চোটেই শরীর এগিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, মাটির ঠেলায় শরীর এগিয়ে গেল কিন্তু পায়ের চাপে মাটি সরল না কেন? এ-প্রশ্নের জবাব এই যে পৃথিবী মানুষের তুলনায় এতবেশি বড়ো যে মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীকে নড়ানো যায় না। কিন্তু পৃথিবী না হয়ে আরো ছোটখাটো জিনিস যদি হত তাহলে পায়ের চাপে সত্যি সত্যিই যে তা নড়ে উঠত তা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো চলে।

কল্পনা করা যাক, লাইনের উপরে দাঁড় করানো একটা ট্রলির উপরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের যা ওজন, ট্রলিরও তাই ওজন। আর অনুমান করে নিতে হবে যে লাইনের উপর দিয়ে ট্রলিটি ঠিক যেন পিছলে চলে যেতে পারে—চাকার সঙ্গে লাইনের মধ্যে এতটুকুও ঘর্ষণ নেই। এবার যদি মানুষটি ট্রলি থেকে সামনের

দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাহলে দেখা যাবে ট্রলিটিও ঝাঁপ দেওয়ার সমান গতিতে পিছনদিকে ছুটে যাচ্ছে।

এই দৃষ্টান্তটিকেই একটু অন্যভাবে ভেবে নিলে রকেটের ছুট দেওয়ার ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া যায়। এবারে কল্পনাশক্তিকে আরেকটু প্রসারিত করতে হবে। ধরা যাক, ট্রলির উপরে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, আর অনেকগুলো ইট সাজানো আছে ট্রলির উপরে। এবারে লোকটি যদি একটা ইট নিয়ে সামনের দিকে ছোঁড়ে—তাহলে দেখা যাবে ট্রলিটি পিছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। হয়তো খুবই সামান্য চলা, টের পাওয়া যাবে কি যাবে না। কিন্তু পর মুহূর্তেই লোকটি যদি দ্বিতীয় আরেকটি ইট নিয়ে প্রথমবারের মতোই সমান জোরে সামনের দিকে ছুঁড়ে মারে—তাহলে? তাহলে ট্রলির পিছনদিকে চলাটা আরেকটু বাড়বে। এইভাবে লোকটি যদি অনবরত সামনের দিকে ইট ছুঁড়ে চলে তাহলে ট্রলিটিও পিছনদিকে ক্রমেই বেশি বেশি জোরে ছুটতে শুরু করবে। আর দেখা যাবে, প্রথম দিকে এক-একটা ইট ছুঁড়ে ট্রলির গতিকে যতোটা না বাড়াতে পারা গিয়েছিল শেষের দিকে এক-একটা ইট ছুঁড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়াতে পারা যাচ্ছে। কারণ, প্রথম দিকে ট্রলিটা ছিল ভারী আর যতোই ইট ছোঁড়া হচ্ছে ততোই সেটা হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবার ইট ছোঁড়ার সময় ট্রলির যা ওজন ছিল, শেষের বার ইট ছোঁড়ার সময় ট্রলির ওজন যদি তার অর্ধেক হয়—তাহলে প্রথমবারের ইট ছুঁড়ে ট্রলির যেটুকু গতি হয়েছিল, শেষের বারের ইট ছুঁড়ে তার দ্বিগুণ গতি হবে।

এই ছোট্ট দৃষ্টান্তটি থেকে রকেটের ছুট দেবার ব্যাপারটার অনেক কিছু বুঝে নেওয়া যায়। এক এক করে বিষয়গুলো তোলা যাক।

ট্রলির শেষ ইটটি ছোঁড়ারপর ট্রলি যে গতিতে ছুটতে শুরু করবে সেটা নির্ভর করছে কিসের উপরে? দুটি জিনিসের উপরে—(১) ইটগুলো কতটা জোরে ছোঁড়া হয়েছে, আর (২) ইটের সংখ্যা। সাধারণ বুদ্ধি

থেকেই বুঝে নেওয়া যায় যে ইটগুলো যতো জোরে ছুঁড়তে পারা যাবে, ট্রলিও ততো জোরে পিছনদিকে ছুটবে।

কিন্তু ইট ছোঁড়ার জোরকে তো আর ইচ্ছে করলেই খুশিমতো বাড়ানো যায় না। তার একটা সীমা আছে। সেই সীমায় পৌঁছে যাবার পরে তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে সেই সময়ে ট্রলি যতোটা জোরে ছুটছে তার চেয়ে বেশি জোরের ছুট ট্রলির পক্ষে আর সম্ভব নয় ?

তাও সম্ভব। তা সম্ভব ইটের সংখ্যা বাড়িয়ে। কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা ধরে নিতে পারলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক, ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ইট ছোঁড়া হচ্ছে। এবং ট্রলি ও লোকটির ওজন ২০০ পাউণ্ড। এবার মানুষসমেত ট্রলিটিকে যদি ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ছোটাতে হয় তাহলে কতগুলি ইট দরকার? হিসেব করে দেখা গেছে, ট্রলি ও মানুষের যা ওজন তাকে ১·৭২ দিয়ে গুণ করে যা পাওয়া যায় ততো ওজনের ইট ছুঁড়তে পারলে শেষ পর্যন্ত মানুষসমেত ট্রলিটির গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ মাইল হবে।

এবার ধরা যাক, ইট ছোঁড়া হবে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে, কিন্তু, মানুষসমেত ট্রলি শেষ পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটতে শুরু করবে —তাহলে কত ইট দরকার? হিসেব করে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে মানুষ ও ট্রলির ওজনকে গুণ করতে হবে ৬·৪ দিয়ে। মানুষ ও ট্রলির ওজন যদি ২০০ পাউণ্ড হয় তাহলে ইটের ওজন হবে ১২৮০ পাউণ্ড।

তেমনি মানুষসমেত ট্রলির গতিকে তিনগুণ করতে হলে গুণ করতে হবে ১৯ দিয়ে।

দৃষ্টান্তটিকে অনেক দূর পর্যন্ত টানা হয়েছে, এবার শেষ একটা কথা বুঝে নেওয়া দরকার। ট্রলির উপর থেকে যে ইটগুলোকে ছোঁড়া হয়েছে, সেগুলো কোথায় গিয়ে পড়ছে তা নিয়ে আমরা একবারও মাথা ঘামাইনি। ইটগুলোকে ছোঁড়া হয়েছে—বাস্, ট্রলিকে ছোটাবার জন্যে শুধু এইটুকুই আমাদের দরকার। তারপরে সেই ইটগুলোর যা খুশি হোক!

রকেট ছোটার ব্যাপারটাও এই একই ধরনের। রকেট হাওয়া ফুঁড়ে ছুটছে না শূন্য দিয়ে ছুটছে তাতে কিছু যায় আসে না—কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত রকেটের পিছন থেকে বন্দুকের গুলির মতো বা ইটছোঁড়ার মতো বস্তুকণা ছুটে বেরিয়ে আসতে থাকবে ততোক্ষণ রকেট সামনের দিকে ঠেলা খাবে।

এখানে একটা বিষয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া দরকার। ঠেলা মানে এই নয় যে রকেট থেকে বেরিয়ে আসা বস্তুকণা বাইরের কোন কিছুকে ঠেলা মারছে আর সেই ঠেলায় রকেট ছুটছে; যেমন নৌকোর দাঁড় জলকে ঠেলা মারে আর সেই ঠেলায় নৌকো চলে। রকেটের ঠেলা খাওয়াটা এই ধরনের ঠেলা নয়। রকেট থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা বস্তুকণা যতো খুশি ঠেলা মারতে পারে কিন্তু তাতে রকেটের কিছু যায় আসে না।

তাহলে রকেটের এই ঠেলা কোথেকে আসে?
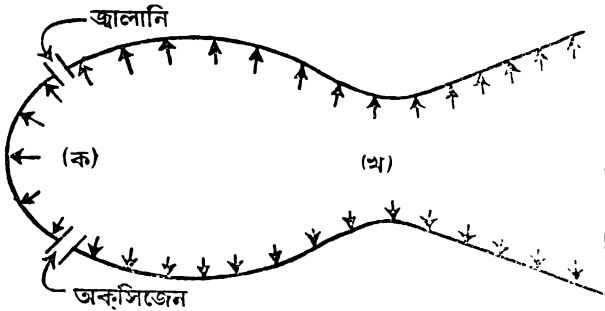
উপরের ছবিটি হচ্ছে রকেটের মোটরের ছবি। মনে করা যাক, কোন একটা উপায়ে এই মোটরের মধ্যে প্রচণ্ড একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো গেছে। এই বিস্ফোরণের ফলে ফেঁপে-ফুলে-ওঠা গ্যাস মোটরের চারদিকে একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে। এখন এই মোটরের কোন দিকে যদি কোন রকম ফাঁক না থাকে তাহলে চারদিকের চাপ সমান হবে এবং মোটরটি স্থির থাকবে। কিন্তু যদি মোটরের (খ) অংশের দিকে একটা ফাঁক থাকে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? (খ)-এর ফাঁক দিয়ে ফেঁপে-ফুলে-ওঠা গ্যাস প্রচণ্ড

গতিতে ছুটে বেরিয়ে যাবে এবং ফলে সেদিকে কোন চাপ থাকবে না। কিন্তু উলটো দিকের (ক)-অংশে আগেকার মতোই চাপ থেকে যাচ্ছে। এই চাপটাই মোটরকে ঠেলা দেয়। আর এই ঠেলার জোরেই রকেট ছুটে চলে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে রকেটের ঠেলাটা তৈরি হচ্ছে রকেটের মোটরের ভিতরেই। একদিকের ফাঁক দিয়ে গ্যাসকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে যাতে সেদিকে কোন চাপ না থাকে। সেই গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিক বা হাওয়ায় ধাক্কা দিক বা কোন কিছুতেই ধাক্কা না দিক—তাতে কিছু যায় আসে না।

এতক্ষণ রকেট সম্পর্কে যা কিছু বলা হল সেগুলি এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়ঃ

(১) রকেটের ছুট বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। হাওয়ার ভিতর দিয়েই ছুটতে হোক বা মহাশূন্য দিয়েই ছুটতে হোক—রকেট ছুটবে নিজস্ব ঠেলার জোরে।

(২) রকেট যতো ছুটবে ততো তার জ্বালানি পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হবে। জ্বালানি যতো নিঃশেষ হবে, রকেট ততো হাল্‌কা হবে। রকেট যতো হাল্‌কা হবে ততো তার ছোটার বেগ বাড়বে।

(৩) রকেটের মোটর থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, বা যাকে বলা যায় রকেটের নিঃসরণ—তা যতো বেগে বেরিয়ে আসতে পারবে রকেটের ছোটার বেগও শেষ পর্যন্ত ততো বেশি হবে।

(৪) আবার জ্বালানির ওজন বাড়িয়েও ছোটার এই বেগকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। জ্বালানির ওজন যদি রকেটের ওজনের ১.৭২ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের সমান। জ্বালানি যদি রকেটের ওজনের ৬.৪ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের দ্বিগুণ। জ্বালানি যদি রকেটের ওজনের ১৯ গুণ হয় তাহলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ হবে নিঃসরণ-বেগের তিনগুণ।

হাউই বা উড়ন-তুবড়ি যে আকাশে ওড়ে তাকেও বলা যেতে পারে রকেটের ক্ষুদে সংস্করণ। তবে রকেটের সঙ্গে হাউই বা উড়ন-তুবড়ির

একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। রকেটের মোটরে চাপ তৈরি করবার জন্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তা আমরা জেনেছি। হাউই বা তুবড়িতেও এমনি বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে যে অক্‌সিজেন দরকার তা রকেটের বেলায় রকেটের ভিতরেই থাকে, কিন্তু হাউই বা তুবড়ির বেলায় বাইরের বায়ুমণ্ডল সেই অক্‌সিজেনের যোগান দেয়। জেটপ্লেনের সঙ্গেও রকেটের তফাৎ এইখানে।

আবার বলছি, হাউই বা উড়ন-তুবড়ি বা জেটপ্লেন বা রকেট যে ছুটে চলে তার কারণ এই নয় যে ভিতরকার গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসে একটা কিছুকে ঠেলা মারছে—আর সেই ঠেলায় এরা ছুটছে। জলকে ঠেলা মেরে মেরে নৌকোর চলার মতো এদের চলা নয়। এদের বেলায় ঠেলাটা তৈরি হচ্ছে মোটরের ভিতরেই—গুলি ছোটবার সময়ে বন্দুকের ভিতরে যেমন একটা ঠেলা তৈরি হয়।
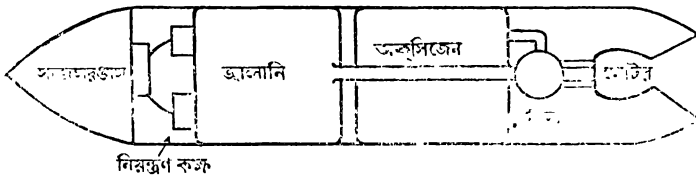
এবার উপরের ছবিটা দেখলে রকেটের অপরিহার্য অংশগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে। দুটি পৃথক কামরায় জ্বালানি আর অক্‌সিজেন থাকে। পাম্পের সাহায্যে জ্বালানি আর অক্‌সিজেনকে নিয়ে আসা হয় মোটরে। সেখানে ঘটে বিস্ফোরণ। তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। তরল জ্বালানি ব্যবহার করার সুবিধে এই যে, তরল জ্বালানির নিঃসরণের বেগ সবচেয়ে বেশি, এবং তরল জ্বালানির চলাচলকে খুব সহজেই কম-বেশি করা যেতে পারে।

নিষ্ক্রমণের সমস্যা

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে
তারা পারে না ললিত লতার বাঁধন
টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে॥

সৌরমণ্ডল নিয়ে আলোচনার সময়ে আমরা জেনেছি যে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে সাত মাইল। অর্থাৎ, কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছুট যদি সেকেণ্ডে সাত মাইলের কম হয়—তাহলে? তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুটি পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে ফিরে আসবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুটি মাটিতে ফিরে আসবে না—পৃথিবীর চারদিকে বিশেষ এক কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করবে। ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আগের আলোচনায় কতগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দগুলির অর্থ সম্পর্কে যাতে কোন রকম ভুল ধারণা না থাকে সেজন্যে আরেকবার বলে নিচ্ছি। 'চক্রবেগ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূর্যের চারদিকে যে-সব গ্রহ পাক খাচ্ছে তারা যে বিশেষ বেগে কক্ষপথে ছুট দিচ্ছে তাকে বলা হয় চক্রবেগ। যে গ্রহ সূর্যের যতো কাছে তার চক্রবেগ ততো বেশি। আবার প্রত্যেকটি বিশেষ গ্রহ একই কক্ষপথে পাক খেতে গিয়ে যখন সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখন তার চক্রবেগ বাড়ে, আবার

যখন দূরে চলে যায় তখন তার চক্রবেগ কমে। সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বুঝে নেওয়া যায় যে চক্রবেগ ঠিক কতটা হবে তা নির্ভর করে টানের কেন্দ্র থেকে ছুটের কেন্দ্র ঠিক কতটা দূরে আছে, পৃথিবীর চারদিকেও যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তাহলে তার চক্রবেগ কতো হবে তা নির্ভর করবে পৃথিবী থেকে সেই কৃত্রিম উপগ্রহের দূরত্বের উপরে। 'নিষ্ক্রমণ-বেগ' ও 'নিঃসরণ-বেগ'—এই দুটি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে বেগের সেই বিশেষ মাপ যেখানে পৌঁছতে পারলে কোন বস্তু কোন গ্রহের টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হতে পারে। নিঃসরণ-বেগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রকেটের বেলায়। রকেটের মোটর থেকে যে বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসে তাকেই বলা হয়েছে নিঃসরণ-বেগ। এবার থেকে এই তিনটি শব্দ আমাদের বারবার ব্যবহার করতে হবে।

নিষ্ক্রমণের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

আমরা জানি, কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দেয় তাহলে সেই বস্তুটি এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারে যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান অকিঞ্চিৎকর। ছুটটা অবশ্য হবে খুবই লম্বা। কিন্তু আমরা যদি হিসেব করে দেখি, সেই লম্বা ছুট দিতে গিয়ে আসলে কতোটুকু শক্তিক্ষয় হয়েছে বা কতোটুকু কাজ করা হয়েছে—তাহলে কিন্তু খুব একটা সহজ হিসেবে পৌঁছনো যায়। বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন, কোন বস্তুকে ৪,০০০ মাইল গভীর একটা খাদের তলা থেকে ছুঁড়ে উপরের মাটিতে পৌঁছে দিতে হলেও এই একই পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়। অবশ্য এই হিসেবের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৪,০০০ মাইল, আর পৃথিবীর টানের জোর খাদের তলা থেকে উপর পর্যন্ত সব জায়গাতেই একই মাপের—ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর টানের জোর যতো, তাই।

এবার ৪০০০ মাইল গভীর একটা খাদকে কল্পনা করা যাক। আরও কল্পনা করা যাক, খাদটির গা পুরোপুরি মসৃণ, খাদের সব জায়গাতেই

নিচের দিকে সমান মাপের টান আছে, আর একটা মার্বেলকে খাদের তলা থেকে ছুঁড়ে উপরের মাটিতে পোঁছে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঘণ্টায় ৫,০০০ বা ১০,০০০ বা ১৫,০০০ মাইল বেগে যদি বলটিকে উপরের দিকে ছোঁড়া হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বারই বলটি কিছুদূর উঠে আবার নিচের দিকে নেমে আসছে। নিচের ছবিতে (ক), (খ) ও (গ) চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে, বলটি কোন্‌বারে কতটা উঁচুতে উঠবে।

সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বুঝে নেওয়া যায় যে বল যতোবেশি বেগে ছোঁড়া হবে, বল উঠবে ততো উঁচুতে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে,
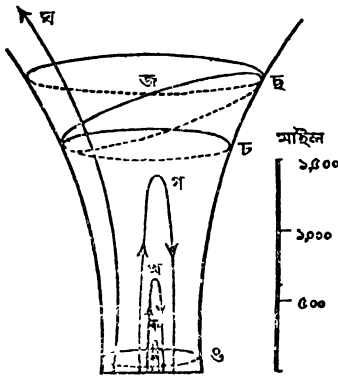
ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে বলটিকে ছুঁড়তে পারলে বলটি আর ফিরে আসছে না, তা উপরের মাটিতে পোঁছে গেছে। এই বেগটিই হচ্ছে নিষ্ক্রমণ-বেগ। ছবিতে (ঘ) চিহ্ন দিয়ে নিষ্ক্রমণ-বেগের ছুটকে দেখানো হয়েছে।

আবার বলটিকে নিয়ে অন্য একটা কাণ্ড করাও সম্ভব। খাদের যে কোন একটা উচ্চতায় বলটিকে এমন একটা বেগে পাক খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় যে বলটি সেই একই উচ্চতায় অনবরত পাক খেতে থাকে। ছবিতে (ঙ), (চ) ও (ছ) চিহ্ন দিয়ে এই ধরনের পাক খাওয়াকে দেখানো হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে, খাদের একবারে তলার দিকে পাক খেতে হলে—যেমনটি (ঙ)তে দেখানো হয়েছে—পাক খাওয়ার বেগ বা চক্রবেগ হওয়া চাই ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। এই দৃষ্টান্ত থেকে ধরে নেওয়া যায় যে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি যদি কোন বস্তুকে উপগ্রহের মতো পাক খাওয়াতে হয় তাহলে সেই বস্তুটির চক্রবেগ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল অবশ্যই

হবে। সম্প্রতি পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির করার সংবাদ খবরের কাগজ মারফত ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন, এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে ২৫০।৩০০ মাইল উঁচুতে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে পাক দেবে।

আবার এই পাক দেওয়ার কক্ষ সব সময়ে বৃত্তের মতো গোল নাও হতে পারে। উপরের ছবির দিকে আবার তাকানো যাক, মনে করা যাক, (ছ)-এর উচ্চতায় বলটিকে যে বেগে পাক দেওয়া হল তা যথেষ্ট নয়, অর্থাৎ চক্রবেগের চেয়ে তা কম। তাহলে ব্যাপারটা কী হবে? বলটি নিচের দিকে নামতে শুরু করবে, একেবারে সরাসরি নিচের দিকে নয়, ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি ট্যারা-ভাবে। আবার আমরা জানি বলটি নিচে নামছে প্রচণ্ড একটা টানে, ফলে টানের পক্ষে নিচে নামতে গিয়ে বলটির বেগ বেড়ে যাবে। আবার বেগ বাড়লেই বলটি আবার টানের বিপক্ষে কিছুটা আসার শক্তি সঞ্চয় করবে এবং (ছ)-এর উচ্চতায় পৌঁছবে। উঁচুতে উঠতে গিয়ে বলের বেগ আবার কমবে, আবার বলটি নিচে নামবে, নিচে নামতে গিয়ে বলের বেগ আবার বাড়বে, আবার বলটি উঁচুতে উঠবে—এমনি চলতে থাকবে ব্যাপারটা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও বলটি পাক দেবে ঠিকই, তবে পাক দেবার কক্ষপথটা হবে উপবৃত্তাকার। সূর্যের চারদিকে প্রত্যেকটি গ্রহ এমনি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। তবে কোন কোন গ্রহের ক্ষেত্রে এই উপবৃত্তের চেহারা প্রায় ডিমের মতো অনেকখানি থ্যাবড়ানো, কোন কোন গ্রহের ক্ষেত্রে পাতিলেবুর মতো প্রায় বৃত্তাকার।

তাহলে এই দৃষ্টান্ত থেকে মোটামুটি যা জানা যাচ্ছে তা এই ঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে বা ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে। যদি ছোটার বেগ আরও কম হয় তাহলে হয় বস্তুটি আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে

আসবে কিংবা যদি বস্তুটিকে সঠিক দিকে ছোটানো যায় তাহলে বস্তুটি পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করবে। আর যদি বস্তুটিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঠিক বাইরে সবচেয়ে কাছাকাছি উচ্চতায় উপগ্রহের মতো পাক খাওয়াতে হয় তাহলে বস্তুটির চক্রবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। এই শেষের হিসেবটি ভালোভাবে মনে রাখা দরকার। পরে যখন আমরা মহাশূন্যের বিরামস্থান বা স্পেস্-স্টেশনের কথা আলোচনা করব তখন এই হিসেবটি কাজে লাগবে। আর 'স্পেস-স্টেশন' কথাটিও মনে রাখা দরকার। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজি 'স্পেস'-কে বাংলায় 'মহাশূন্য' বলেছি। আর স্টেশন হচ্ছে বিরামস্থান। এর পর থেকে মহাশূন্যের বিরামস্থানকে লেখার ও বলার সুবিধার জন্যে আমরা বলব 'স্পেস-স্টেশন।' আর ইংরেজি 'স্পেশ-শিপ' শব্দটির বদলে বাংলা 'ব্যোমযান' শব্দটি আগেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সেকেণ্ডে সাত মাইল মাপের একটা বেগ তৈরি করে অমন ছুট দেবার দরকার কি? আগাগোড়া পথটাই আরো কম বেগে ধীরেসুস্থে ওঠা যাক না কেন? জবাবে বলতে হবে, এখন পর্যন্ত রকেটের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন যে-সব উপাদানের সন্ধান আমাদের জানা আছে তা নিয়ে এটা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে আগাগোড়া পথটাই আমাদের যেতে হচ্ছে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে। কল্পনা করা যাক যে একটা মোটর-গাড়ি একটা উঁচু পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করছে। দু-ভাবে সেটা করা যেতে পারে। একটা উপায় হচ্ছে, আগাগোড়া পথে গাড়ির মোটর চালু রেখে সমান বেগে উঠে যাওয়া; দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে পাহাড়ের তলাতেই গাড়ির এমন একটা বেগ তৈরি করে নেওয়া যে বাকি পথটুকু মোটর বন্ধ করে রাখলেও নিজের বেগেই গাড়ি উপরে উঠে আসবে। রকেটের বেলায় আমরা দ্বিতীয় উপায়টিকে নিয়েছি। কারণ, প্রথম উপায়ে রকেটটি যদি ধীরেসুস্থে পৃথিবীর টানকে

অতিক্রম করবার চেষ্টা করে তাহলে আগাগোড়া সময়েই রকেটের মোটরকে চালু রাখতে হয়। তাহলে এমন ব্যাপারও হতে পারে যে রকেটের সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরেও রকেটটি খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। এমন কি দেখা যেতে পারে, পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে একই উচ্চতায় থাকবার জন্যেই রকেটের সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আরো বহুগুণ শক্তিশালী জ্বালানি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রথম উপায়টির শরণ নেওয়ার কথা তাই ভাবা চলে না।

সুতরাং, আপাতত সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দেবার কথাই আমাদের ভাবতে হবে।

এবার দেখা হাক, এখন পর্যন্ত যে-সব জ্বালানির সন্ধান পাওয়া গেছে তার সাহায্যে রকেটকে সেকেণ্ড সাত মাইল বেগে বা ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে ছুট দেওয়ানো যায় কিনা।

এখন পর্যন্ত যা সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় যে রকেটের সবচেয়ে ভালো জালানি হচ্ছে পেট্রল ও তরল অক্‌সিজেনের মেশাল। এই জ্বালানির নিঃসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ৭,০০০ ফিট। এবার হয়তো অনেকে হেসে উঠে বলবেন, তাই যদি হয় তো এমন সাতকাণ্ড রামায়ণ ফাঁদার কি দরকার ছিল! কোথায় সেকেণ্ডে সাত মাইল আর কোথায় সেকেণ্ডে ৭,০০০ ফিট! রকেটকে যদি নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুটই দেওয়ানো না গেল—তবে আর এতসব অবান্তর কথা বলে লাভ কী! কিন্তু মনে রাখতে হবে, বৈজ্ঞানিক জগতে অসম্ভাব্য বলে কিছু নেই। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই আজকের দিনের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী জ্বালানির সন্ধান পাওয়া যাবে। হয়তো পরমাণবিক শক্তিকেই রকেটের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে কত কিছুকেই তো আমরা অসম্ভব বলে মনে করতাম—কিন্তু আজ আর করি না। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে কোথা দিয়ে কোন্ সম্ভাবনার দিগন্তকে উন্মোচিত করবে তা আগে থেকেই দাগ টেনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়। বৈজ্ঞানিকরা এমন কতগুলি উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন যার সাহায্যে আজকের দিনের কম-শক্তিশালী জ্বালানি দিয়েও রকেটকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়ানো যেতে পারে।

রকেট সম্পর্কে এর আগে আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি তা থেকে আমরা জানি যে রকেটের চূড়ান্ত বেগ যদি নিঃসরণ-বেগের সমান হতে হয় তাহলে জ্বালানির ওজন হওয়া দরকার রকেটের ওজনের ১·৭২ গুণ। রকেটের চূড়ান্ত বেগকে নিঃসরণ-বেগের দ্বিগুণ হতে হলে জ্বালানির ওজন হবে রকেটের ওজনের ৬·৪ গুণ। তিন গুণ হতে হলে ১৯ গুণ। কিন্তু আমাদের জ্বালানির নিঃসরণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৭,০০০ ফিট, বা বলা যেতে পারে সেকেণ্ডে ১·৩৬ মাইল। রকেটের চূড়ান্ত বেগ যদি এই নিঃসরণ-বেগের তিন গুণও হয় তাহলেও তা নিষ্ক্রমণ-বেগের সমান হয় না। নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৭ মাইল। এই বেগে পৌঁছতে হলে রকেটের চূড়ান্ত বেগ জ্বালানির নিঃসরণ-বেগের পাঁচ গুণেরও বেশি হওয়া দরকার। হিসেব করে দেখা গেছে, সেকেণ্ডে ১·৩৬ মাইল নিঃসরণ-বেগের জ্বালানি ব্যবহার করে রকেটের চূড়ান্ত বেগকে যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইলের নিষ্ক্রমণ-বেগে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে জ্বালানির ওজন হওয়া দরকার রকেটের ওজনের ৯৯৯ গুণ। মনে করা যাক, রকেটের ওজন ১ টন, তাহলে জ্বালানির ওজন হবে ৯৯৯ টন। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ, রকেটের সাজসরঞ্জাম, বিভিন্ন কক্ষ, আরোহী, জ্বালানির ট্যাংক্—ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ওজন যদি ১ টনের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, তাহলে সেখানে ৯৯৯ টন জ্বালানি নেবার মতো জায়গা রাখতে হবে। রকেটের ওজন যতো বাড়বে, জ্বালানির ওজনও ততো বাড়বে। রকেটের ওজন যদি হয় ৬ টন, তাহলে জ্বালানির ওজন হবে ৫,৯৯৪ টন।

সুতরাং অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবা দরকার। এমন একটা উপায় যাতে অনেক কম পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে রকেটকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছোটানো যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিকরা এই বিশেষ উপায়টির নাম দিয়েছেন স্টেপ-রকেট। বাংলায় বলা যেতে পারে ধাপ-রকেট। অবশ্য এই ধাপ-রকেটও একটা খুব নিখুঁত ব্যাপার হতে পেরেছে তা নয়। তবে আগের উপায়টির চেয়ে এটি বহুলাংশে উন্নততর।

'ধাপ-রকেট' নাম শুনেই ব্যাপারটা আঁচ করে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, এখানে নিষ্ক্রমণ-বেগে ধাপে ধাপে পৌঁছনো হবে। মনে করা যাক, তুটি ধাপে নিষ্ক্রমণ-বেগে পৌঁছনো হবে স্থির করা হল। প্রথম ধাপে সেকেণ্ডে ৩·৫ মাইল, দ্বিতীয় ধাপে বাকি ৩·৫ মাইল। আমরা ধরে নিচ্ছি, আমাদের রকেটের ওজন হচ্ছে ৬ টন, জ্বালানির নিঃসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ১·৩৬ মাইল। হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, এই রকেটটিকে যদি সেকেণ্ডে ৩·৫ মাইল বেগে ছোটাতে হয় তাহলে জ্বালানির পরিমাণ হওয়া দরকার রকেটের ওজনের ১২·৫ গুণ। আর বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদিকে যদি হিসেবের মধ্যে ধরা যায় তাহলে এই পরিমাণ হবে ৩১ গুণ। রকেটের ওজন ধরে নেওয়া হয়েছে ৬ টন। তাহলে মোট জ্বালানির পরিমাণ ৩২×৬=১৯২ টন। অর্থাৎ, রকেট ও জ্বালানির মোট ওজন ১৯২+৬=১৯৮ টন।

এই ১৯৮ টন গেল প্রথম ধাপে। দ্বিতীয় ধাপের বেলায় এসে এই ১৯৮ টন ওজনটাই পুরোপুরি রকেটের ওজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার উপর আছে দ্বিতীয় ধাপের কাঠামো, জ্বালানির ট্যাংক ইত্যাদির ওজন। ধরা যাক, আরো ১৯২ টন। অর্থাৎ মোট ওজন দাঁড়াচ্ছে ১৯২+১৯২=৩৮৪ টনে। এবার হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, এই ৩৮৪ টন ওজনের রকেটটিকে আবার যদি সেকেণ্ডে ৩·৫ মাইল বেগে ছোটাতে হয় তাহলে জ্বালানি লাগবে ১১,৯০৪ টন। অর্থাৎ রকেট ও জ্বালানির মোট ওজন হবে ১১,৯০৪+৩৮৪= ১২,২৮৮ টন। তু-ধাপ রকেটের ব্যাপারটা বোধ হয় এবার বোঝা গেছে। সোজা কথায়, একটা রকেটের ভিতরে আরেকটা রকেট পুরে দেওয়া। এক ধাপে বাইরের রকেট ভিতরের রকেটকে সেকেণ্ডে

৩'৫ মাইল বেগে ছুট দেওয়াবে। আরেক ধাপে ভিতরের রকেটটির বেগ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আসলে কিন্তু দুই ধাপেই সমান বেগ তৈরি হচ্ছে। তবে শেষের ধাপের শুরুতেই রকেটের ছোটার বেগ ছিল সেকেণ্ডে ৩'৫ মাইল। আরো ৩'৫ মাইল যোগ হয়ে শেষ পর্যন্ত বেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৭ মাইলে।

একটা ছক কেটে দেখালে দু-ধাপ রকেটকে বুঝতে আরো সুবিধা হবে। ছকটা এইরকম :

ধাপ	রকেটের ওজন (টন)	জ্বালানির ওজন (টন)	মোট ওজন (টন)	বেগ মাইল/সেকেণ্ড
১ম	৬	১৮৬	১৯২	৩'৫
২য়	১৯২	১১,৯০৪	১২,০৯৬	৩'৫
মোট	১৯৮	১২,০৯০	১২,২৮৮	৭'০

দেখা যাচ্ছে, দু-ধাপ রকেটেও ৬ টন ওজনের একটি রকেটকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছোটাতে সবসুদ্ধ জ্বালানি লাগছে ১২,২৮৮ টন। এটাও যে খুব সুবিধের ব্যাপার হচ্ছে তা নয়। তবে এখানে যদিও শেষ পর্যন্ত রকেটটির ওজন থাকছে মাত্র ৬ টন, কিন্তু প্রতি ধাপেই জ্বালানি নেবার মতো জায়গার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে।

একই রকম ভাবে তিন-ধাপ রকেটও হতে পারে। দু-ধাপ রকেটের বেলায় যেমন ভাবে হিসেব করা হয়েছে, তিন-ধাপ রকেটের বেলাতেও হুবহু সেই একই হিসেব। আলাদা আলাদা হিসেবের মধ্যে না গিয়ে প্রথমে তিন-ধাপ রকেটের ছক কেটে নেওয়া যাক।

দেখা যাচ্ছে, তিন-ধাপ রকেটের বেলায় জ্বালানি অনেক বেশি লাগছে। তবে একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে, প্রতি ধাপেই জ্বালানির ওজন রকেটের ওজনের ১০ গুণেরও কম হচ্ছে। অর্থাৎ জ্বালানির

ট্যাংক, প্রতি ধাপেই অপেক্ষাকৃত ছোট হচ্ছে এবং রকেটের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সেই অনুপাতে বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে। জ্বালানি বেশি

ধাপ	রকেটের ওজন (টন)	জ্বালানির ওজন (টন)	মোট ওজন (টন)	বেগ মাইল/সেকেণ্ড
১ম	৬	৫৪	৬০	২.৩৪
২য়	৬০	১,০৮০	১,১৪০	২.৩৩
৩য়	১,২০০	২১,৬০০	২২,৮০০	২.৩৪
মোট	১,২৬৬	২২,৭:৪	২৪,০০০	৭.০২

লাগছে বটে, কিন্তু তার বদলে রকেটের কাঠামো তৈরি করার দিক থেকে সুবিধাও হয়ে যাচ্ছে বড়ো রকমের।

এই ছকদুটো থেকে একটি ভারী কৌতূহলের ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

দু-ধাপ রকেটের বেলায় দেখা যাচ্ছে, রকেটের মোট ওজন ১৯৮ টন। অথচ শেষ পর্যন্ত রকেটটির ওজন থাকছে ৬ টন। তিন-ধাপ রকেটের বেলাতেও দেখা যাচ্ছে, রকেটের কাঠামোর মোট ওজন ১,২৬৬ টন, এবং এখানেও শেষ পর্যন্ত রকেটের ওজন থাকছে ৬ টন। কাঠামোর বাকি ওজনটুকু কোথায় যায়? সোজা কথায় বলা যায়, বাকি ওজনটুকুকে ফেলে দেওয়া হয়। কাঠামো তৈরি করার সময়েই জ্বালানির ট্যাংকগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন জ্বালানি নিঃশেষিত হয়ে গেলেই শূন্য ট্যাংক খসে পড়ে। মিথ্যে বোঝা বয়ে লাভ কী? এমন কি এক-একটা ধাপের জন্যে এক-একটা বড়ো ট্যাংক তৈরি না করে অনেকগুলো ছোট-ছোট ট্যাংক তৈরি করা যেতে পারে। এক-একটি ট্যাংক শূন্য হবে আর খসে পড়বে। মহাশূন্যে যাতায়াতের পক্ষে বোঝা যতো হাল্‌কা হয় ততোই ভালো।

এতক্ষণ আমরা সমস্ত হিসেব করেছি রকেটের জ্বালানির নিঃসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ১'৩৬ মাইল ধরে। কিন্তু এমন কোন জ্বালানি যদি পাওয়া যায় যার নিঃসরণ-বেগ এর দ্বিগুণ বা চারগুণ—তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? এক-ধাপ রকেটের বেলায় আমরা দেখেছি, নিঃসরণ-বেগ ১'৩৬ মাইল হলে নিষ্ক্রমণ-বেগে পৌঁছবার জন্যে জ্বালানির প্রয়োজন হয়, রকেটের ওজনের ৯৯৯ গুণ। হিসেব করে দেখা গেছে, নিঃসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ২'৭২ মাইল হলে জ্বালানির প্রয়োজন হবে রকেটের ওজনের মাত্র ৩১ গুণ। আর নিঃসরণ-বেগ ৫'৪৪ মাইল হলে, জ্বালানি চাই রকেটের ওজনের ৪'৫ গুণ। একটা ছক কেটে এই হিসেবগুলো পাশাপাশি সাজানো যাক ঃ

নিঃসরণ বেগ মাইল | সেকেণ্ড	জ্বালানির ওজন (রকেটের ওজনের কত গুণ হবে—সেই হিসেবে)	মোট ওজন (রকেটের ওজন ছয় টন ধরে নিয়ে
১'৩৬	৯৯৯	৬,০০০
২'৭২	৩১	১৯২
৫'৪৪	৪'৫	৩৩

ছকটির শেষ স্তম্ভে তাকালে চমকে উঠতে হয়। কোথায় ৬,০০০ টন আর কোথায় ৩৩ টন! এমন কি নিঃসরণ-বেগকে মাত্র দ্বিগুণ করতে পারলেও মোট ওজন দাঁড়ায় ১৯২ টন। কোথায় ৬,০০০ টন আর কোথায় ১৯২ টন!

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নিঃসরণ-বেগকে কি দ্বিগুণ করা যায় না? যুক্তির দিক থেকে বলা চলে, নিশ্চয়ই যায়। যেমন তরল হাইড্রোজেনকে তরল অক্সিজেনের সঙ্গে মেশাল দিলে সেকেণ্ডে প্রায় ১৭,০০০ ফিট নিঃসরণ-বেগ পাওয়া যায়। তরল হাইড্রোজেনের

সঙ্গে তরল ওজোনের মেশাল দিতে পারলে পাওয়া যায় সেকেণ্ডে প্রায় ১৯,০০০ ফিট। আবার যদি এক-পরমাণুওলা হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের মেশাল দেওয়া যায় তাহলে সেকেণ্ডে প্রায় ৭০,০০০ ফিট নিঃসরণ-বেগ পাওয়া যেতে পারে। এগুলি সবই সম্ভাবনার কথা। বাস্তবক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তরল হাইড্রোজেন বা তরল ওজোন কিছুতেই সুস্থির হয়ে থাকতে চায় না—আচমকা মারাত্মক সব কাণ্ড করে বসে। সুতরাং এদের পোষ মানাতে না পারা পর্যন্ত এদের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না।

তারপরে পরমাণু শক্তিকে হয়তো এ-ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে। এবং যেহেতু বিজ্ঞানের জগতে অসম্ভাব্য বলে কিছুই নেই, সুতরাং এ আশা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতেই উচ্চতর নিঃসরণবেগ-সম্পন্ন জ্বালানির সন্ধান পাওয়া যাবে।

আবার একথাও যেন মনে না করা হয় যে সেই সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত গ্রহান্তরে অভিযান বন্ধ রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি তা থেকে এই কথাটি অন্তত স্পষ্ট হয়েছে যে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে, গ্রহান্তরে যাত্রা শুরু করবার মতো কৃৎ-কৌশলগত জ্ঞান মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছে। সুতরাং এ-ব্যাপারে ইতস্তত করবার কোন কারণ নেই। ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গ্রহান্তর-যাত্রাকে আরো সুগম ও সহজসাধ্য করবে মাত্র।

এবার গ্রহান্তরে যাবার পথের হদিশ জানবার চেষ্টা করা যাক।

গ্রহান্তরের পথ

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।

এর আগে কল্পনার রকেটে চেপে চাঁদে বেড়াতে যাবার সময় আমরা আলোচনা করেছি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে হয়তো এমন সব মৃত্যুবাণ আছে যাদের সত্যিকারের চেহারা আমরা এখনো জানি না। সুতরাং গ্রহান্তরের যাত্রা শুরু করবার আগে আমাদের প্রথম কাজ হবে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্য সম্পর্কে খানিকটা খোঁজ-খবর নেওয়া।

আমাদের প্রথম কাজ হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এমন একজন দূতকে পাঠানো যে নাকি খবরাখবর পাঠাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঠিক বাইরেই সৃষ্টি করতে হবে একটি উপগ্রহ। টেলিভিশন ও রেডিও দিয়ে তৈরি হবে এই উপগ্রহ-দূতের চোখ আর কান। মহাশূন্যে বেগুনি-পারের আলো বা মহাজাগতিক রশ্মির চেহারা কি রকম, তা পৃথিবীতে বসেই আমরা জানতে পারব আমাদের এই দূতের চোখ ও কান মারফত। বলা বাহুল্য, আমাদের এই দূতটি মহাশূন্যের এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে না, ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলবে।

এই প্রাথমিক কাজটুকু হয়ে যাবার পরে আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে, চাঁদের দেশে অন্য একজন দূতকে পাঠানো। আমরা জানি, আমাদের এই দূতকে যদি চাঁদের দেশে পাঠাতে হয়, তাহলে তার যাত্রার শুরুতেই তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিতে হবে। এমন এক ধাক্কা যাতে সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগের একটা ছুট তৈরি হতে পারে। এই ছুট

তৈরি হতে পারলেই সে পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে হাজির হতে পারবে মহাশূন্যের ত্রিশঙ্কুরাজ্যে। অবশ্য পৃথিবীর টান ইতিমধ্যে তার ছোটার বেগ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে; শেষ পর্যন্ত তা এসে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় কয়েক-শো মাইলে। তবে একটা সুবিধে এই যে ত্রিশঙ্কু-রাজ্যে পৌঁছবার পর আমাদের দূত বিনা আয়াসেই দূরত্ব অতিক্রম করবে। তারপর থেকে তার ছোটার বেগ আর বিশেষ কমবে না। আর কোন্‌দিকে সে যাবে তা যদি আগে থেকেই ঠিক করা থাকে তাহলে দিন পাঁচেকের মধ্যেই সে গিয়ে পৌঁছবে চাঁদের দেশে। এবার একটা বিপদ হতে পারে। পৃথিবীর মতো চাঁদেরও টান আছে। চাঁদের রাজ্যের সীমানায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদ তাকে টান মারবে, ফলে তার ছোটার বেগ যাবে বেড়ে। শেষ পর্যন্ত চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়বে ঘণ্টায় ৫,০০০ মাইল বেগে।

সুতরাং তাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে অন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই: আমাদের দূতকে এমনভাবে ছোটাতে হবে যাতে সে সরাসরি চাঁদের সঙ্গে ধাক্কা না খায়, যাতে সে চাঁদকে একপাশে রেখে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে। তাহলেই সে চাঁদের উপরে আছড়ে না পড়ে চাঁদের চারদিকে পাক খেতে শুরু করবে—ঠিক যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চারদিকে পাক খায়। ওদিকে টেলিভিশন ও রেডিও দিয়ে আমরা আমাদের দূতের চোখ আর কান তৈরি করে দিয়েছি। সেই চোখ আর কান দিয়ে সে চাঁদের খবরাখবর সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের শুধু একদিকটা দেখি, আমাদের দূত দেখবে চতুর্দিক। আমাদের দূতের কাছ থেকে চাঁদ কোন খবরই লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

তাহলে শুধু চাঁদের দেশেই বা কেন, দূত পাঠানো যাক শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে। না পাঠাবার কোন কারণ নেই। কারণ শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে দূত পাঠাবার জন্যে আমাদের বাড়তি কোন আয়োজন করতে হবে না। সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে ছুট দেওয়াতে পারলেই

আর কোন্ দিকে ছুটবে সেটা ঠিকভাবে দাগ টেনে দিতে পারলেই, আমাদের দূত অনায়াসে শুক্র বা মঙ্গলগ্রহে পৌঁছতে পারে। যেহেতু মহাশূন্যের ত্রিশঙ্কুরাজ্যে বিনা আয়াসেই দূরত্ব অতিক্রম করা চলে— সুতরাং আমাদের দূতের পথখরচা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। অবশ্য চাঁদে যাবার সময়ে আমাদের দূত যে-পরিমাণ বেগ নিয়ে রওনা হয়েছিল, শুক্র বা মঙ্গলে যেতে ওর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি বেগ প্রয়োজন হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে, শুক্র বা মঙ্গলের রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে সে যেন সরাসরি টানের মধ্যে গিয়ে না পড়ে, একটু পাশ কাটিয়ে গিয়ে উপগ্রহের মতো পাক খায়। বাস্, তারপর পৃথিবীতে বসেই আমাদের দূতের চোখ ও কান মারফত শুক্র বা মঙ্গলের খবরাখবর পাওয়া যাবে।

শত্রু এলাকায় অভিযান শুরু করার আগে সেনাপতি যেমন চারদিকে চর পাঠায় খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্যে, তেমনি আমাদেরও সশরীরে অভিযান শুরু করার আগে গ্রহান্তরে চর পাঠাতে হবে। নির্ভুলভাবে জানতে হবে সমস্ত খবর।

আমাদের দূত কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে, সেটাই প্রথমে ঠিক করে নেওয়া দরকার।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চাঁদে যাওয়া আর গ্রহান্তরে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রায় এক নিশ্বাসে আলোচনা করেছি। আসলে কিন্তু চাঁদে যাওয়ার চেয়ে গ্রহান্তরে যাওয়া অনেক বেশি দুরূহ ও অনেক বেশি জটিল। গ্রহান্তর বলতেও আপাতত আমরা শুক্র ও মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন গ্রহের কথা একেবারেই ভাবব না।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আড়াই লক্ষ মাইলেরও অনেক কম। আর পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্রের দূরত্ব আড়াই কোটি মাইলেরও অনেক বেশি। এ থেকেই বোঝা যায়, চাঁদ পৃথিবীর এত কাছাকাছি রয়েছে যে চাঁদে যাওয়ার পথ খুঁজে বার করবার জন্যে সূর্য বা অন্য কোন গ্রহের কথা না ভাবলেও চলে। গ্রহান্তরে যাওয়ার কাছে চাঁদে যাওয়াটা প্রায় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার—

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার কাছে একটা ডোবা পার হওয়া। কিন্তু এই ছেলেমানুষি ব্যাপারটাই এখনো পর্যন্ত সেরে ফেলা যায়নি। বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা এখনো এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এই ছেলেমানুষি ব্যাপারটার উপরেই যে পরিমাণ অঙ্ক কষা হয়েছে তা দেখলে পিলে চমকে ওঠে।

পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে যেমন আমি-তুমি তুমি-আমি সম্পর্ক, পৃথিবী ও অন্য কোন গ্রহের মধ্যে কিন্তু তা নয়। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্রে যেতে হলেও দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। চাঁদে যাওয়াটা যদি একঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া হয়, তাহলে গ্রহান্তরে যাওয়াটা এক রাজপথ থেকে আরেক রাজপথে যাওয়া। আর রাজপথে চলতে হলে যেমন রাজার আইনকানুনকে মেনে চলতে হয়, তেমনি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যেতে হলেও সূর্যকে কুর্নিশ করে যেতে হবে। এখন পর্যন্ত সূর্যের কথা আমরা ভাবিইনি, কিন্তু এবার ভাবতে হবে। সৌরমণ্ডলের ন-টি গ্রহ বাঁধা আছে সূর্যের টানে। পৃথিবীর টানকে আগে আমরা ৪,০০০ মাইলের একটা খাদের সঙ্গে তুলনা করেছি, সেই হিসেবে সূর্যের টানটা হচ্ছে ১,২০,০০,০০০ মাইলের একটা খাদের মতো। কল্পনা করা চলতে পারে, আমাদের সেই মার্বেলবলের মতো ন-টি ছোট-বড় গ্রহ এই সুবিপুল খাদের বিভিন্ন উচ্চতায় উপবৃত্তাকারে পাক খেয়ে চলেছে। সুতরাং এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রা করতে হলে আমাদের চলতে হবে সূর্যের বিপুল টানের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। শুক্র ও বুধ—এই দুটি গ্রহ আছে ভিতরের দিকে, সুতরাং এই দুটি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের পক্ষে। আর বাইরের দিকে আছে ছ-টি গ্রহ—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। এই ছ-টি গ্রহে যাবার রাস্তা সূর্যের টানের বিপক্ষে।

আগেই বলেছি, শুক্র বা মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন গ্রহের কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে। সুতরাং দেখা যাক, শুক্র বা মঙ্গলে যাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা কী আছে।

স্রোতস্বতী নদী পার হতে হলে কী-ভাবে পার হওয়া সবচেয়ে সহজ? অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক সিধে রাস্তায় নদী পার হবার চেষ্টা করলে শক্তিক্ষয় করতে হয় অনেক বেশি। নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নদী পার হতে পারলে দূরত্ব হয়তো অনেক বেশি অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু পরিশ্রম হয় সবচেয়ে কম।

এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাবার পথ ঠিক করবার সময়েও আমরা এই নীতি মেনে চলব। এখানে নদীর স্রোতটা হচ্ছে কক্ষপথে পৃথিবীর গতি। আমাদের ব্যোমযান যখন পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠে আসে, তখন পৃথিবীর এই গতিটুকুও সে সঞ্চয় করে আনে। কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার। চলন্ত ট্রেন থেকে যদি কোন লোক লাফিয়ে পড়ে, তাহলে দুটি বিভিন্ন বেগ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়; একটি তার নিজস্ব লাফের বেগ, অপরটি চলন্ত ট্রেনের বেগ। তেমনি আমাদের ব্যোমযান যখন সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবে তখন সেই ব্যোমযানের মধ্যে পৃথিবীর নিজস্ব গতিও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। আবার পৃথিবীর গতি দু-ধরনের—বার্ষিক ও আহ্নিক। কক্ষপথে পৃথিবীর বার্ষিক গতি ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল। এই গতি পৃথিবীর সর্বত্রই সমান। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি সবচেয়ে বেশি বিষুবরেখায়; ঘণ্টায় ১,০০০ মাইলেরও কিছু বেশি। সুতরাং বিষুবরেখা থেকে যদি আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেয়, তাহলে এই দুটি বেগও ব্যোমযানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। একেবারে বিনা খরচে পাওয়া ঘণ্টায় ৬৭,৬০০ মাইলের বেগ কম কথা নয়। সুতরাং গোঁয়ার্তুমি করে এই বেগের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা না করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এভাবে যেতে পারলে ব্যোমযানের অনেক কম শক্তিক্ষয় হবে।

তবে এই সহজতম অতিক্রমণের পথ দূরত্বের দিক থেকে কিন্তু অনেকখানি বেড়ে যায়। পরের পৃষ্ঠায় একটা হিসেব তুলে দিচ্ছি:

এবার কল্পনা করা যাক, আমাদের ব্যোমযান পৃথিবীর টানকে ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উঠে এসেছে। পৃথিবী থেকে ছুট দেবার সময়ে

গ্রহ	পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব	সহজতম অতিক্রমণের দূরত্ব
শুক্র	২,৬০,০০,০০০	২৫,০০,০০,০০০
মঙ্গল	৩,৫০,০০,০০০	৩৪,৫০,০০,০০০

ব্যোমযানটির যে নিজস্ব বেগ ছিল তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে আসতে গিয়ে। কিন্তু পৃথিবীর নিজস্ব গতিও ব্যোমযানটির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আছে। সেই গতিকে যদি বাধা দেবার চেষ্টা করা না হয়, তাহলে ব্যোমযানটি সেই গতি নিয়ে ছুট দেবে। কোন্‌দিকে ছুট দেবে? কক্ষপথে পৃথিবী যেদিকে ছুট দিচ্ছে, সেদিকে। খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের ব্যোমযান মহাশূন্যের এমন এক জায়গায় এসে পৌঁচেছে যেখানে পৃথিবীর টান অকিঞ্চিৎকর। তাহলে আর কোন্ টান আছে? পৃথিবীর টান যেখানে অকিঞ্চিৎকর, সেখানে অন্যান্য গ্রহের টানকেও অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে। তাহলে বাকি থাকে শুধু সূর্যের টান। সূর্যের টানটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার মতো ব্যাপার নয়। তা যদি হত তাহলে পৃথিবী বহু আগেই সূর্যের টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দিত। পৃথিবীর মতো আস্তো একটা গ্রহই যখন তা পারেনি, সুতরাং আমাদের ব্যোমযানও তা পারবে না। সে যতোই ছুট দিতে চেষ্টা করুক, সূর্য তাকে অদৃশ্য টানের সুতোয় বেঁধে রেসের ঘোড়ার মতো পাক খাওয়াবে। আর ব্যোমযানটির বেগ যদি পৃথিবীর বেগের সমান হয় তাহলে পৃথিবীর কক্ষপথেই সেটি পাক খেতে শুরু করবে। কিন্তু পৃথিবী থেকে ছুট দেবার সময়ে ব্যোমযানটির নিজস্ব বেগ যদি এমন হয় যে পৃথিবীর টানের বাইরে এসেও তার খানিকটা অবশিষ্ট

থেকে গেছে এবং সব মিলিয়ে ব্যোমযানটির ছোটার বেগ পৃথিবীর ছোটার বেগের চেয়ে বেশি—তাহলে কী হবে? তাহলে ব্যোমযানটি নিশ্চয়ই পৃথিবীর কক্ষপথে পাক দিতে শুরু করবে না; যেহেতু পৃথিবীর ছোটার বেগের চেয়ে ব্যোমযানের ছোটার বেগটা বেশি, অতএব সে সূর্য থেকে দূরে সরতে আরম্ভ করবে। আবার সূর্যের টানের বিরুদ্ধে দূরে সরছে বলে, যতোই দূরে সরবে ততোই তার ছোটার বেগ কমবে। আর এইভাবে ছোটার বেগ কমতে কমতে একসময়ে তার আর দূরে সরবার ক্ষমতা থাকবে না, সূর্যের টানে আবার পিছিয়ে আসতে হবে তাকে। কিন্তু এই পিছিয়ে আসার আগেই যদি ব্যোমযানটি মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে পৌঁছে যায়—তাহলেই তো আমাদের কার্যসিদ্ধি। আর ঠিক সেই বিশেষ সময়ে মঙ্গলগ্রহটিও যদি কক্ষপথের সেই বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে—তাহলেই মঙ্গলগ্রহের টান আমাদের ব্যোমযানকে নিজের দিকে টেনে নেবে।

আবার, পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবার সময় আমাদের ব্যোমযানের নিজস্ব বেগ যদি এমন হয় যে মহাশূন্যে এসে তার নিজস্ব বেগ তো খরচ হয়েই গেছে, এমন কি পৃথিবীর যে বেগ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তারও কিছুটা খোয়া গেছে—তাহলে কী হবে? এবার পৃথিবীর ছোটার বেগের চেয়ে ব্যোমযানের ছোটার বেগ কম, অতএব সে সূর্যের টানে সূর্যের দিকে সরে যাবে। আর যতোই সরবে, সূর্যের টানের পক্ষে যাচ্ছে বলে ততোই তার বেগ বাড়বে। শেষকালে বেগ বাড়তে বাড়তে এমন এক সময় আসবে যখন সূর্যের টানকে কিছুটা অগ্রাহ্য করে আবার দূরে সরে যাবার ক্ষমতা হবে তার। কিন্তু দূরে সরে আসবার আগেই যদি আমাদের ব্যোমযান শুক্র-গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছে যায় আর শুক্রগ্রহটি যদি ঠিক সেই কক্ষপথের বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে—তাহলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি।

পরের পৃষ্ঠায় দুটি ছবি এঁকে দেখানো হল, আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে বা পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে কী ভাবে গিয়ে পৌঁছবে।

সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, এভাবে যাত্রা করাটা মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া। এমন একটা পাকাপাকি হিসেব করে বেরোতে হবে যেন শুক্রগ্রহ বা মঙ্গলগ্রহ একটা বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ে কক্ষপথের এক বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে। যেমন
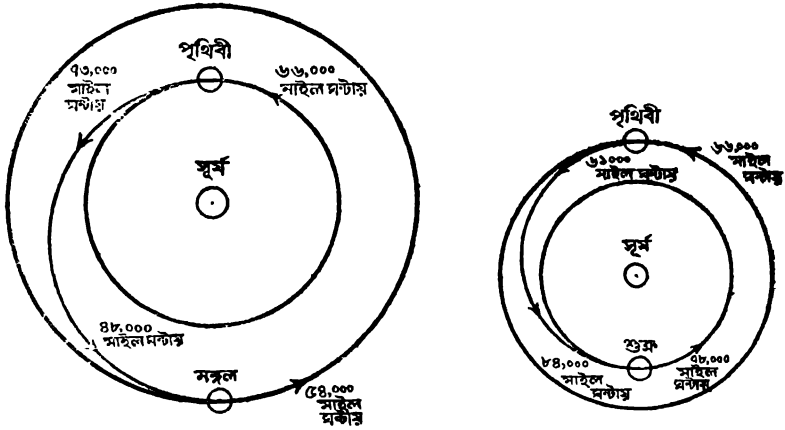
ধরা যাক, উপরে বর্ণিত উপায়ে পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে পৌঁছতে ১৪৫ দিন সময় লাগবে। এই ১৪৫ দিনে শুক্রগ্রহ তার কক্ষপথের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পার হয়ে যায়। সুতরাং ১৪৫ দিন আগে থেকেই এমন একটা হিসেব করে বেরোতে হবে যাতে ১৪৫ দিন পরে ব্যোমযান শুক্রগ্রহের কক্ষপথের যে বিন্দুতে এসে পৌছবে, ঠিক সেই সময়ে শুক্রগ্রহও ঠিক সেই বিন্দুতে থাকবে। যদি না থাকে? তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই বর্ধিত-গতি ব্যোমযান সূর্যের টানকে কিছুটা অগ্রাহ্য করে পৃথিবীর কক্ষের দিকে চলে আসবে এবং সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকারে একটা পাক দিয়ে ২৯০ দিন পরে এসে পৌঁছবে পৃথিবীর কক্ষে তার যাত্রারম্ভের বিন্দুতে। কিন্তু পৃথিবী ইতিমধ্যে সেই বিন্দু থেকে সরে গেছে। তখন আবার ব্যোমযানটি যাত্রা শুরু করবে ঠিক আগেকার পথ ধরেই শুক্রগ্রহের কক্ষের দিকে। সেখানে সেই বিশেষ বিন্দুতে এবারেও যদি শুক্রগ্রহের সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে ব্যোমযানটি ঠিক আগেকার পথ ধরেই যাত্রা শুরু করবে পৃথিবীর কক্ষপথের যাত্রারম্ভের বিন্দুর দিকে।

এইভাবে ২৯০ দিনের এক-একটা পাকের পুরো পাঁচটা পাক দেবার পরে ব্যোমযানের সঙ্গে দেখা হবে পৃথিবীর। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা। পৃথিবী থেকে রওনা হবার ২৫৮ দিন পরে ব্যোমযান এসে পৌঁছবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষে। সেখানে যদি ব্যোমযানের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সাক্ষাৎ না হয় তাহলে ব্যোমযান সূর্যের চারদিকে একটা উপবৃত্তাকার পাক শেষ করে ৫১৬ দিন পরে ফিরে আসবে পৃথিবীর কক্ষে যাত্রারম্ভের বিন্দুতে। কিন্তু পৃথিবী তখন সেখানে নেই। পৃথিবী ইতিমধ্যে পুরো একটা পাক শেষ করে দ্বিতীয় পাকের আধাআধি চলে গেছে। এবারেও পৃথিবীর সাক্ষাৎ পাবার জন্যে ব্যোমযানটিকে ৫১৬ দিনের এক-এক পাকের বেশ কয়েকটা পাক দিতে হবে।

এ তো গেল কোন রকমে গিয়ে পৌঁছনোর ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও নিরাপদে নেমে আসার প্রশ্ন আছে। পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় তাও তো এক ধরনের পৌঁছনো। কিন্তু সেই পৌঁছনোর শেষ পরিণতি হচ্ছে কয়েক মুহূর্তের আলোর ঝলক আর খানিকটা ছাই। আমাদের ব্যোমযানেরও এই পরিণতি হোক, তা নিশ্চয়ই আমরা চাই না।. সুতরাং কি-ভাবে নামা যেতে পারে, সে সম্পর্কেও আগে থেকে আঁটঘাট বেঁধে নিতে হবে।

অবশ্য চাঁদের মতো হাওয়াশূন্য দেশও আছে। হাওয়া নেই বলেই ব্যোমযানে আগুন ধরে যাবার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু আছড়ে পড়ে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা আছে পুরোপুরি।

কাজেই চাঁদই হোক বা শুক্র-মঙ্গলই হোক, নিরাপদে নেমে আসার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এখানে স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও যদি ব্যোমযানের কিছুটা জ্বালানির সঞ্চয় না থাকে তাহলে নিরাপদ অবতরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। আর শুধু অবতরণটাই তো আর শেষ কথা নয়। ফিরে আসার প্রশ্নও আছে। সেজন্যেও জ্বালানির যোগান চাই।

এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, কোন রকমে পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো একটা ছুট করতে গিয়েই রীতিমতো তোলপাড় কাণ্ড করতে হয়েছে। তোলপাড়ের সবটাই জ্বালানি নেবার ব্যবস্থা করা নিয়ে। যাই হোক, কয়েক হাজার টন জ্বালানি পুড়িয়ে তো ব্যোমযানকে মহাশূন্যে তোলা হয়েছে। তারপরেও যদি বলা হয় যে আরও কয়েক হাজার টন জ্বালানি চাই নামবার জন্যে ও ফিরে আসবার জন্যে তাহলে আবার বলতে হয়, সাতমন তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের অসাধ্য কিছু নেই। রাধাকে নাচাবার ব্যবস্থা তারা করেছেন। সেই ব্যবস্থাটির নাম—মহাশূন্যের বিরামস্থান বা স্পেস-স্টেশন।

স্পেস-স্টেশন

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খান্ খান্,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃত বারি ;
শঙ্খ কহে হুহুংকারি, বাঁধন সে তো মায়া—
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া ॥

মোটরগাড়িতে যদি পৃথিবী ভ্রমণ করতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তেলের যোগান চাই। তেলের যোগান ঠিক থাকলে যতোদূর খুশি এবং যতোদিন খুশি ঘুরে বেড়ানো চলে। মহাশূন্যেও যদি এমনি কতগুলি জ্বালানি মজুদ রাখার স্টেশন তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে ব্যোমযানও যতোদিন খুশি এবং যেখানে খুশি চলে ফিরে বেড়াতে পারে।

মহাশূন্যে ব্যোমযানের জ্বালানি মজুদ রাখার স্টেশন তৈরি করার কথা ভাবতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা স্পেস-স্টেশনের পরিকল্পনা করেছেন। স্পেস-স্টেশনে নানা ধরনের বন্দোবস্ত থাকবে। আর স্পেস-স্টেশন তৈরি করার পিছনে যদি সত্যি সত্যিই উদ্দেশ্য হয় মানুষের কল্যাণ করা—তা হলে তা কী যে বিরাট ব্যাপার হতে পারে এবং কী বিপুল অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে তার কিছুটা আভাস পরে দেবার চেষ্টা করব। আপাতত দেখা যাক, স্পেস-স্টেশন কি-ভাবে তৈরি হবে।

আমরা জানি, কোন বস্তু যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চক্রবেগে পাক দিতে শুরু করে তাহলে তা অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর একটি উপগ্রহের মতো পাক খেতে থাকবে। সেই পাক খাওয়ার কক্ষপথ বৃত্তাকার হতে পারে, উপবৃত্তাকার হতে পারে ; আবার সেই উপবৃত্ত

হতে পারে খুব চ্যাপ্টা বা প্রায়-গোল। সবই নির্ভর করবে বস্তুটির ছোটার বেগের উপরে। আমরা এও জানি যে পৃথিবী থেকে শ-তিনেক মাইল দূরে থেকে যদি কোন বস্তুকে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে হয় তাহলে সেই বস্তুটির চক্রবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। হিসেব করে দেখা গেছে, ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ছুটে এই বস্তুটি নব্বুই মিনিটের কিছু বেশি সময়ে পৃথিবীকে এক-একবার পাক দেবে। পৃথিবী থেকে বস্তুটি যদি আরও দূরে থাকে, তাহলে চক্রবেগ হবে আরো কম। যেমন বলা যায়, বস্তুটি যদি পৃথিবী থেকে ৩০০ মাইল দূরে না থেকে থাকে ১,০৭৫ মাইল দূরে তাহলে বস্তুটির চক্রবেগ হওয়া প্রয়োজন ঘণ্টায় ১৫,৮৪০ মাইল এবং এই বিশেষ উচ্চতায় ও বিশেষ চক্রবেগে বস্তুটি প্রতি দু-ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে পাক দেবে। অর্থাৎ পৃথিবীর থেকে বস্তুটি যতো দূরে যাবে, চক্রগতি ততোই কমবে, পাক দেবার সময় ততোই বাড়বে। পৃথিবী থেকে ২২,০০০ মাইল দূরে থেকে কোন বস্তু যদি চক্রবেগে পৃথিবীকে পাক দেয় তাহলে তার এক-একটি পাকের জন্যে সময় লাগবে পুরো ২৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে যেন এই বস্তুটি মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে—তার উদয়ও নেই, অস্তও নেই।

উদয় ও অস্ত সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি পৃথিবীর চরকিপাকটা চলছে পশ্চিম থেকে পূবে। তাই আকাশের পূবদিকটা উদয়াচল, পশ্চিমদিকটা অস্তাচল। কিন্তু কোন বস্তু যদি পৃথিবীকে পশ্চিম থেকে পূবে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে তাহলে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে আমরা বস্তুটিকে কোন্ দিকে উদয় হতে ও কোন্ দিকে অস্ত যেতে দেখব? তা নির্ভর করবে বস্তুটির চক্রবেগের উপরে। চক্রবেগ যদি এমন হয় যে বস্তুটি চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে এক-একবার প্রদক্ষিণ করছে, তাহলে আমরা বস্তুটিকে পশ্চিমদিকে উদয় হয়ে পূব দিকে অস্ত যেতে দেখব। যদি প্রদক্ষিণের সময় ২৪ ঘণ্টার বেশি হয় তাহলে

পূব দিকে উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে। আর যদি প্রদক্ষিণের সময় পুরোপুরি ২৪ ঘণ্টা হয় তাহলে বস্তুটির উদয়াস্ত নেই ; বস্তুটিকে মনে হবে মহাশূন্যের স্থির একটি বিন্দু।

প্রসঙ্গ থেকে যখন কিছুটা সরে আসাই গেছে তখন পুরনো একটা কথার উপর আর একবার জোর দিয়ে নেওয়া যাক।

কথাটা হচ্ছে সেই বহু-আলোচিত টান আর ছুট নিয়ে। সমগ্র মহাবিশ্বে যে কোথাও ঠোকাঠুকি নেই, সর্বত্র যে এমন অটুট শৃঙ্খলা ও এমন অবিচল নিয়মানুবর্তিতা—সবের মূলেই রয়েছে এই টান আর ছুট। মহাবিশ্ব তো অতি বৃহৎ একটা ব্যাপার। মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি, পরিসর ও আয়তনের কাছে আমাদের এই আকাশগঙ্গার বিশ্বকেই নগণ্য বলে মনে হয়! সেই নগণ্যের মধ্যেও নগণ্য আমাদের এই সৌরমণ্ডল। কিন্তু সৌরমণ্ডলেও রয়েছে টান ও ছুটের সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত টানাপোড়েন। সূর্যের টানে আপন আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে চলেছে ন-টি গ্রহ। যে গ্রহ সূর্যের যতো কাছে তার চক্রবেগও ততো বেশি, তার সূর্য-প্রদক্ষিণের সময়ও ততো কম। এক-একটি গ্রহ যে বিশেষ এক-একটি কক্ষে থাকে তার মূল কারণ—এক-একটি গ্রহের এক-একটি বিশেষ চক্রবেগ। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবী তার কক্ষপথের যে বিন্দুতে আছে সেই বিন্দু থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না তার কারণ সূর্যের টান আছে, আবার সূর্যের টানে সে সরাসরি সূর্যের দিকেই চলতে শুরু করছে না তার কারণ তার ছুট আছে। কক্ষপথের প্রতিটি বিন্দুতেই এই টানের জোর আর ছুটের জোর সমান। কল্পনা করা যাক, ঠিক এই মুহূর্তে কক্ষপথে পৃথিবীর ছোটার বেগ আচমকা বেড়ে গেল। তাহলে কী হবে? তাহলে টানের জোরের চেয়ে ছুটের জোর বেশি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পৃথিবী তার পুরনো কক্ষপথ ছেড়ে সূর্যের টানের বিরুদ্ধে বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। আর টানের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে যতোই যাবে ততোই বেগ কমবে। শেষ পর্যন্ত বেগ কমতে কমতে পৃথিবী এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছবে যেখানে

সূর্যের টানের জোর পৃথিবীর ছোটার জোরের সমান। বাস, শুরু হল আবার সেই পাক খাওয়া। মোট ফলটা দাঁড়াবে এই যে পৃথিবীর কক্ষপথটা ঠিক আগেকার মতো রইল না, একটুখানি বদলে গেল। তেমনি ঠিক এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর ছোটার বেগ আচমকা কমে যায়—তাহলে কী হবে? অনায়াসেই বলা চলে যে যেহেতু এক্ষেত্রে সূর্যের টানের জোর পৃথিবীর ছোটার জোরের চেয়ে বেশি, সুতরাং পৃথিবী এবার সূর্যের টানের বিপক্ষে বাইরের দিকে ছিট্‌কে না গিয়ে সূর্যের টানের পক্ষে ভিতরের দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে ছিট্‌কে আসবে। এবং যেহেতু সূর্যের টানের পক্ষে যাচ্ছে, অতএব যতোই যাবে ততোই বাড়বে ছোটার বেগ। বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর ছোটার জোরটা সূর্যের টানের জোরের সমান হয়ে যায়। বাস, তারপরেই আবার যথারীতি পাক খাওয়া। এবারেও মোট ফল দাঁড়াবে এই যে পৃথিবীর কক্ষপথের চেহারাটা একটু পাল্‌টে গেল। তবে মনে রাখতে হবে যে তু-বারের পাল্‌টানো একই ধরনের নয়। প্রথমবারে পৃথিবীর কক্ষপথ আরেকটু বাইরের দিকে প্রসারিত হয়েছে, দ্বিতীয়বারে আরেকটু সংকুচিত হয়েছে ভিতরের দিকে। এই তু-ধরনের পাল্‌টানোর মধ্যে মিল এইটুকু যে, যে-বিশেষ বিন্দু থেকে পৃথিবীর গতি বেড়েছে বা কমেছে, সেই বিশেষ বিন্দুটি তু-বারেই পরিবর্তিত কক্ষপথেও থেকে গেছে। এই বিশেষ বিন্দুটিকে কক্ষপথে বজায় রেখেই তু-বারেরই যা কিছু পরিবর্তন। আর এই প্রসঙ্গে অন্য যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে সূর্যের টানের দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবী ভারশূন্য। সূর্য ও পৃথিবীর টান-ছুটের মধ্যে কোথাও কোন রকম বাধা নেই—অর্থাৎ কল্পনা করা চলতে পারে যে সূর্যের টানে পৃথিবীর চলাটা অবাধ; অতএব সূর্যের কাছে পৃথিবী ভারশূন্য। শুধু পৃথিবী নয়, অন্য প্রত্যেকটি গ্রহ।

এই টান-ছুটের ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারা গেলে এই মহাবিশ্ব একটা রহস্যই থেকে যাবে। এমন কি স্পেস-স্টেশন

কি-ভাবে তৈরি হবে তা বুঝতে হলেও টান-ছুট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

আর ঠিক যেমন সূর্যকে ঘিরে গ্রহ আছে, তেমনি আছে গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহ। গ্রহ-উপগ্রহ কেন ঠিক জায়গায় থাকছে, কেন খসে পড়ছে না বা কেন ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিচ্ছে না—তার কারণটুকু যদি বুঝতে পারা গিয়ে থাকে, তাহলে অনায়াসে কল্পনা করা চলে যে প্রত্যেকটি গ্রহের চারপাশে কতগুলি কৃত্রিম উপগ্রহও সৃষ্টি করা চলে। স্পেস-স্টেশন এমনি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এক নির্দিষ্ট উচ্চতায় হবে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির অবস্থান, এবং নির্দিষ্ট চক্রবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। এবং যেহেতু পৃথিবী ও উপগ্রহটির টান-ছুটের মধ্যে কোথাও কোন রকম বাধা নেই অতএব উপগ্রহটি হবে ভারশূন্য।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, কোন রকেটকে বা ব্যোমযানকে নিষ্ক্রমণ-বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেওয়ানো যেতে পারে। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন একটা নির্দিষ্ট বেগে ও নির্দিষ্ট দিকে ব্যোমযানটিকে এমনভাবে ছুট দেওয়ানোও যেতে পারে যে ব্যোমযানটি শ-তিনেক মাইল উপরে উঠে এসে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে উপগ্রহের মতো পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে শুরু করবে। তারপর খুশিমতো আরও একাধিক ব্যোমযান উঠে আসুক এবং একইভাবে পাক খেতে থাকুক। অর্থাৎ ব্যোমযানগুলি একই কক্ষপথে একই বেগে পাক খেতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মহাশূন্যে উঠে আসার পর ব্যোমযানগুলির কিছুমাত্র ওজন নেই। এবং যেহেতু সবকটি ব্যোমযান একই বেগে অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ছুটছে, অতএব এক ব্যোমযান থেকে অপর ব্যোমযানের দিকে তাকিয়ে মনে হবে যেন সেটি স্থির হয়ে আছে। গতি টের পাওয়া যাবে অনেক নিচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে। তাও মনে হবে যেন ব্যোমযান স্থির হয়ে আছে আর পৃথিবীটা প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার করে পাক খাচ্ছে।

আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় এক এরোপ্লেন থেকে আরেক এরোপ্লেনে তেল নেওয়া হয়, এ-ব্যাপারটা হয়তো অনেকেই জানেন। দুটি প্লেন যদি একই বেগে ওড়ে তাহলে এক প্লেন থেকে অপর প্লেনের দিকে তাকিয়ে মনে হবে যেন সেটি স্থির, সুতরাং তেল নেওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক এমনিভাবে গ্রহান্তরে যাবার পথেও বিশেষ ব্যোমযানটি জ্বালানি সংগ্রহ করবে। উপায়টি হবে এই : ব্যোমযানটি প্রথমে উঠে আসবে স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে এবং সেখানে স্পেস-স্টেশনের পাশাপাশি চক্র-বেগে কিছুক্ষণ পাক দেবে ; সেই অবস্থায় স্পেস-স্টেশন থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে নেওয়া ব্যোমযানটির পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত কাজ হবে না ; এবং যেহেতু কোন কিছুর ওজন নেই সুতরাং অনায়াসেই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ট্যাংকসমেত এক ব্যোমযান থেকে খুলে নিয়ে এসে বিশেষ ব্যোমযানে লাগিয়ে নেওয়া যাবে।

আর মাঝপথে এভাবে জ্বালানি নিতে পারার বিশেষ একটা সুবিধেও আছে। জ্বালানি নেবার সময়ে ব্যোমযানটির বেগ থাকে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। সুতরাং জ্বালানি নেবার পরে বাড়তি আর ৭,০০০ মাইলের বেগ সঞ্চয় করতে পারলেই ব্যোমযানটি পৃথিবীর টানের বাইরে চলে যেতে পারে।

'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো' বলে বাংলায় একটা কথা আছে। এটাও প্রায় সে-ধরনের ব্যাপার। পৃথিবীর টান আছে বলেই মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়াটা এত শক্ত ব্যাপার। এই শক্ত ব্যাপারটাকেই সহজ করে ফেলা হয় স্পেস-স্টেশন তৈরি করে। এই স্পেস-স্টেশন কি-ভাবে তৈরি হচ্ছে ? না, পৃথিবীর টানের পাল্‌টা ছুট তৈরি করে। অর্থাৎ টানের বাঁধন বড়োবেশি শক্ত বলে যে বিশেষ ব্যবস্থা—সেই বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে কারণ টানের বাঁধন বড়োবেশি শক্ত।

আর মহাশূন্যে যদি স্পেস-স্টেশনই তৈরি করতে পারা গেল তবে তার ব্যবহার শুধু বাড়তি জ্বালানির যোগান দেবার কাজেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে কেন ? উঠে আসুক আরো অজস্র যন্ত্রপাতি।

তৈরি হোক বিরাট এক গবেষণাগার। গবেষণার এমন আদর্শ অবস্থান আর কোথাও পাওয়া যাবে? এখানে বস্তুর ভার নেই, স্নুতরাং বিরাট বিরাট আকারের যন্ত্রপাতিকে অনায়াসে নাড়াচড়া করা চলবে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র? পৃথিবীতে একটি ২০০ ইঞ্চি মাপের দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তার কাঠামোটাই হয়ে ওঠে এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার যে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বহু অংশকেই নড়ানো-চড়ানো যায় না। স্পেস-স্টেশনের মহাশূন্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র হতে পারে যতো খুশি লম্বা, যতো খুশি বড়ো। কয়েক মাইল দূরে দূরে ছুটো লেন্স ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার শুধু, তাহলেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি। মাঝখানে কোন কাঠামোর প্রয়োজন হবে না—কোন কিছুর ভার নেই এখানে; যে জিনিসটি যেখানে রাখা হবে সেখানেই থেকে যাবে। তাছাড়া এখানে হাওয়া, মেঘ বা ধুলো দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করবে না। এমন একটা আশ্চর্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও এমন আশ্চর্য পরিবেশ পাওয়া গেলে মহাবিশ্বের অন্ধিসন্ধি জানতে আর বাকি থাকবে নাকি কিছু?

শুধু কি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা? পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা নয়? এখানে কোন কিছুর ভার নেই, এখানে স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়ে আছে এক নিশ্ছিদ্র ভ্যাকুয়াম, এখানে অতি সহজেই শূন্যমানের তাপমাত্রা তৈরি করে নেওয়া চলে—এখানে যদি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার স্নুবিধে না হয় তো আর কোথায় হবে?

গবেষণা চলুক মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে, গবেষণা চলুক বেগুনি-পারের আলো নিয়ে, গবেষণা চলুক বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তর নিয়ে।

শুধু কি গবেষণা? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলকে এক-একবার পর্যবেক্ষণ করে আসা যাচ্ছে না? কোথায় কখন ঝড়ো মেঘ জড়ো হচ্ছে তার খবর মুহূর্তের মধ্যে চলে আসবে পৃথিবীর মানুষের কাছে। আর শুধু ঝড়ের খবরই দেবে না, সমুদ্রের জাহাজ ও আকাশের এরোপ্লেনের কাছে নির্ভুল একটা নিশানার মতো দ্যুতিমান হয়ে থাকবে।

তা ছাড়াও কত কী! সূর্য থেকে যে বিপুল পরিমাণ তেজ মহাশূন্যে বিকীরিত হচ্ছে তার মাত্র দু-শো কোটি ভাগের এক ভাগ পৃথিবীর ভাগে পড়ে। এই অকিঞ্চিৎকর ভাগেরও আবার অনেকটাই আত্মসাৎ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে সূর্যের যেটুকু তেজ এসে পৌঁছয় তা প্রায় কিছুই নয়। অথচ সূর্যের তেজকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে কী না করা যায়! অধ্যাপক জোলিও-কুরি হিসেব করে দেখেছেন যে মিশরদেশের সমান আয়তন স্থানে সূর্যের যেটুকু তেজ এসে পড়ে, তার দশ ভাগের এক ভাগকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে গোটা পৃথিবীর বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সুতরাং মস্ত একটা আয়না বা এই ধরনের একটা কিছু ব্যবস্থা করে সংগ্রহ করা যাক না কেন সূর্যের অফুরন্ত আলো ও উত্তাপ। তা দিয়ে চলুক ডায়নামো, তৈরি হোক পাওয়ার স্টেশন। পৃথিবীর কোথায় চলেছে অনাবৃষ্টি—গলিয়ে ফেলা যাক বরফ, উড়ে আসুক বৃষ্টিভরা মেঘ, অজস্র ধারায় মাটির ফাটল বুজে যাক। পৃথিবীর কোথায় শুরু হয়েছে মহামারী—জীবাণুনাশক সূর্যের আলো আরো জোরালো হয়ে এসে পড়ুক সেখানে, দূর হোক সমস্ত রোগ। দূরপাল্লায় রেডিও ও টেলিভিসনের ঢেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছে—তৈরি হোক মহাশূন্যের রীলে-স্টেশন, রেডিও ও টেলিভিসনের বার্তা হবে সর্বতোগামী।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পরে দ্রুত স্বাস্থ্যলাভের জন্যে কোথায় আসবে মানুষ? না, স্পেস-স্টেশনে। হার্টের অসুখ হলে কোথায় আসবে মানুষ চিকিৎসার জন্যে? না, স্পেস-স্টেশনে। সবচেয়ে বড়ো হাসপাতাল থাকবে কোথায়? না, স্পেস-স্টেশনে।

অবারিত আলো, অবারিত দৃষ্টি আর অবারিত সম্ভাবনার এই আশ্চর্য দেশ মানুষের কল্যাণের জন্য যে কত অসংখ্যভাবে নিয়োজিত হতে পারে তা এখন থেকে পুরোপুরি ফিরিস্তি করে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। স্পেস-স্টেশনের চেহারা কি রকম হবে তার একটা ছবি এই বইয়ে দেওয়া হল। আর স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে চক্রবেগে পাক খেতে

খেতে গ্রহান্তরগামী ব্যোমযান কিভাবে জ্বালানি সংগ্রহ করবে তারও একটা ছবি সেই সঙ্গে আছে।

জ্বালানি সংগ্রহ করার ছবির দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় যে একাধিক মানুষ ব্যোমযান বা স্পেস-স্টেশনের আশ্রয় ছেড়ে বাইরে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে বললে কথাটার মধ্যে ভুল থেকে যায়। নৌকো ভেসে বেড়ায় জলে বা বেলুন ভেসে বেড়ায় বাতাসে—কিন্তু এটা সে-ধরনের ভেসে বেড়ানো নয়। ছবিতে মানুষগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে কারণ তাদের শরীরের কোন ওজন নেই। এ কথাটা বোঝা দরকার।

মানুষগুলোর দিকে ভালোভাবে তাকালে আর একটা জিনিস চোখে পড়ে। ওরা কেমন এক অদ্ভুত পোশাক পরে আছে। এই পোশাকের নাম দেওয়া হয়েছে স্পেস-স্যুট বা মহাশূন্যের পোশাক। ডুবুরীদের বা পর্বতারোহীদের যেমন বিশেষ বিশেষ ধরনের পোশাক আছে, তেমনি এই পোশাক হচ্ছে মহাশূন্যের যাত্রীদের। অবশ্য যাত্রীরা যতোক্ষণ ব্যোমযানের কামরায় থাকে ততোক্ষণ এই পোশাক পরার দরকার হয় না কারণ কামরার মধ্যে বায়ুর চাপ ও উত্তাপ বজায় রাখার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু কামরার বাইরে উন্মুক্ত মহাশূন্যে বেরিয়ে আসতে হলে এই বিশেষ পোশাকের প্রয়োজন হয়। মহাশূন্যে বায়ু নেই আর উত্তাপ যা-খুশি হতে পারে। সুতরাং এই পোশাকে মানুষের সর্বাঙ্গ মোড়া থাকে। আর সেই পোশাকের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে নিশ্বাস নেবার জন্যে অক্সিজেনের যোগান থাকে, শরীরের বাইরে চাপ ও উত্তাপ বজায় রাখা হয়। তাছাড়া আছে কথা বলবার ও শোনবার জন্যে রেডিওযন্ত্র, নড়েচড়ে বেড়াবার জন্যে ক্ষুদে সংস্করণের জেট-মেশিন। জেট-মেশিনের ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। মাটির উপরে আমরা চলাফেরা করি পা ফেলে ফেলে, মাটির উপরে বিপরীত দিকের চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু মহাশূন্যে চলাফেরা করার উপায় কী? যেখানে কোন কিছুর ভার নেই সেখানে চাপ সৃষ্টি

হবে কী করে ? সুতরাং মহাশূন্যে ঠিক যে প্রক্রিয়ায় রকেট ছুটে চলে ঠিক সেই একই প্রক্রিয়ায় মানুষের যাতায়াত।

স্পেস-স্টেশনের চেহারা কী রকম, তাতে কী কী অংশ থাকবে, কি-ভাবে তা জোড়া লাগানো হবে—তা নিয়ে অনেকে অনেক রকম পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এমন কি স্পেস-স্টেশন কোন্ উচ্চতায় থাকবে তাও বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিভিন্নভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। স্থায়ী স্পেস-স্টেশন নির্মাণ করতে হলে অন্তত হাজার মাইল উচ্চতা হওয়া দরকার। আগেই বলেছি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আচমকা শেষ হয়ে যায়নি, বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারের মতো আস্তে আস্তে মিলিয়েছে, সুতরাং ৩০০ মাইলের উচ্চতায় কিছু কিছু বায়ুকণা থাকা বিচিত্র নয়। আর বায়ুকণা থাকা মানেই ব্যোমযানের গতি ব্যাহত হওয়া, কারণ বায়ুকণাকে ঠেলে সরিয়ে ব্যোমযানকে পথ করে নিতে হবে। স্পেস-স্টেশনকে যদি কক্ষচ্যুত হতে না হয় আর চক্রবেগকে অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে এমন উচ্চতায় তাকে স্থাপন করতে হবে যেখানে বায়ুকণার অস্তিত্ব কিছুতেই সম্ভব নয়।

আর, এ, স্মিথ ও এইচ, ই, রস নামে দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর একটি পরিকল্পনা আছে। স্মিথ-রস স্পেস-স্টেশনের তিনটি পৃথক অংশ—প্রথম অংশটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সমেত মস্ত একটি আয়না ; দ্বিতীয় অংশে আবাস-কামরা, ল্যাবরেটরি, গবেষণাগার, কারখানা ইত্যাদির ব্যবস্থা ; তৃতীয় অংশটি হচ্ছে অবলম্বন-দণ্ডের শেষ প্রান্তে মস্ত একটি এরিয়াল, যার অবস্থান খুশিমতো পরিবর্তিত করা চলে। স্পেস-স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা হচ্ছে, অবলম্বন-দণ্ডের অন্য প্রান্তে একটি বিশেষ ধরনের কামরার ভিতর দিয়ে। স্পেস-স্টেশনের অভ্যন্তরভাগে বায়ুর চাপ ও উত্তাপ এমনভাবে বজায় রাখা হবে যাতে স্বাভাবিক জীবনধারণ করা চলে।

এখানে মস্ত একটা আপত্তি উঠতে পারে। স্পেস-স্টেশনের ভারশূন্য অবস্থায় শুধু বায়ুর চাপ ও উত্তাপ বজায় রাখতে পারলেই স্বাভাবিক জীবনধারণের অবস্থা সৃষ্টি করা হল—একথা কিছুতেই

বলা চলে না। শরীরের ভার সৃষ্টি করতে হবে—ঠিক পৃথিবীর মাটিতে যেমন প্রত্যেকটি জিনিসের ভার আছে তেমনি। বৈজ্ঞানিকরা এ সমস্যারও সমাধান করেছেন। মনে রাখা দরকার যে ভার সৃষ্টি করতে হলে একটা টান থাকা চাই ও টানের বিরুদ্ধে বাধা থাকা চাই। স্মিথ-রস স্পেস-স্টেশনের আবাস কামরায় এই দুটিরই ব্যবস্থা করা হয়েছে এক অদ্ভুত উপায়ে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, গোটা স্পেস-স্টেশনটি হচ্ছে একটি চাকতির মতো আর এই চাকতির মাঝখানে আছে অক্ষদণ্ড, বা আগে যাকে বলেছি অবলম্বন-দণ্ড। চাকতির মতো এই স্পেস-স্টেশনটি অক্ষদণ্ডের চারপাশে চরকিপাক খেয়ে চলেছে। স্পেস-স্টেশনের দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ আবাস-কামরা ইত্যাদি থাকে চাকতির বেড়-এ। আসলে চাকতির বেড়টাই এইসব কামরার মেঝে, ছাদ থাকে কেন্দ্রের দিকে। এখন, কোন মানুষ যদি কোন একটা কামরায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার পা থাকে চাকতি বেড়-এর উপরে, মাথা থাকে চাকতির কেন্দ্রের দিকে। মোটরের চাকা ঘুরবার সময়ে টায়ার থেকে যেমন কাদা ছিট্‌কে ছিট্‌কে যায়, তেমনি এই ঘূর্ণ্যমান চাকতির বেড়-এর দিকে দাঁড়ানো মানুষটিও ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু তার পা রয়েছে বেড়-এর ভিতর দিকে, বেড় ফুটো হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াল এই যে, কামরাগুলোর ভিতরে মেঝের দিকে একটা টান তৈরি হচ্ছে। আর কামরার মেঝেটাই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই টানের বিরুদ্ধে। তার মানেই ভার সৃষ্টি হওয়া। ঠিক কতোটা ভার সৃষ্টি হবে তা নির্ভর করবে ঠিক কতোটা জোরে চাকতি ঘুরছে তার উপর।

মনে রাখা দরকার যে স্পেস-স্টেশনের ভিতরের মানুষটি কিন্তু কোন গতিই টের পাবে না। স্পেস-স্টেশন ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে মহাশূন্যে ছুটছে—সেই গতিও না, স্পেস-স্টেশনের চাকতি অক্ষ-দণ্ডের চারপাশে চরকিপাক খাচ্ছে—সেই গতিও না। আমাদের

এই পৃথিবীরও ঠিক এই দু-ধরনের গতিই আছে কিন্তু তার কোনটাই আমরা টের পাই না।

স্পেস-স্টেশনের কামরায় এই যে কৃত্রিম ভার সৃষ্টি করবার ব্যাপার—তা কিন্তু চাকতির বেড়-এর দিকেই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। যতো চাকতির কেন্দ্রের দিকে আসা যাবে ততো ভার কমবে। শেষকালে অক্ষদণ্ডের বিশেষ এক বিন্দুতে কোন ভারই নেই। কারণ চাকতি যখন ঘোরে, তখন বেড়ের কাছে কোন বিন্দু যে বেগে ঘোরে—অক্ষদণ্ডের কাছাকাছি কোন বিন্দুর ঘোরার বেগ তার চেয়ে অনেক কম। বেগ যেখানে বেশি, কৃত্রিম ভারও সেখানে বেশি, বেগ কমলে কৃত্রিম ভারও কমে যায়।

স্পেস-স্টেশনের যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন, একথা ঠিক যে স্পেস-স্টেশনের এক-একটি বিচ্ছিন্ন টুকরোকে পর্যন্ত উপরে তুলে আনবার জন্যে বিপুল পরিমাণ শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং উর্ধ্বগামী রকেটগুলোকেই এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন রকেটের অংশগুলোই উপরে উঠে স্পেস-স্টেশনের অংশ হয়ে যেতে পারে। এক চিলতে বাড়তি জিনিসকেও যেন মিথ্যে উপরে তুলে আনা না হয়, এককণা বস্তুকেও যেন বাতিল করতে না হয়।

স্মিথ-রস স্পেস-স্টেশনে ২৪ জন মানুষের জায়গা করা হয়েছে। এই ২৪ জন মানুষের জন্যে জল-বায়ু-খাদ্য প্রয়োজন। হিসেব করে দেখা গেছে, ২৪ জন মানুষের জন্যে প্রতিদিন প্রয়োজন হবে ৫২ পাউণ্ড খাদ্য, ৮৪.৭ পাউণ্ড অক্সিজেন, ১,৩০২ পাউণ্ড জল। এই হিসেবে সারা বছরে সবসুদ্ধ ৭১ টন ওজনের জল-বায়ু-খাদ্য পৃথিবী থেকে পাঠাতে হবে। কি-ভাবে ও কি-আকারে পাঠানো হবে সে-সম্পর্কেও বিস্তৃত পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জার্মান 'ভি-২' রকেটের আবিষ্কর্তা ডাঃ ভন ব্রন-এর একটি পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবী থেকে ১,০৭৫ মাইল উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। আমরা জানি ১০৭৫ মাইলের

কক্ষপথের চক্রবেগ হচ্ছে প্রায় ১৬,০০০ মাইল। অর্থাৎ, মানুষের তৈরি এই উপগ্রহটি যদি পৃথিবী থেকে ১০৭৫ মাইল দূরত্বে এসে ঘণ্টায় ১৬,০০০ মাইল বেগে ছুটতে শুরু করে তাহলে তা পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করবে।

উপগ্রহটিকে কক্ষপথে উঠিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে ডাঃ ব্রন যে রকেটের পরিকল্পনা দিয়েছেন তার মোট ওজন হচ্ছে ৭,০০০ টন। মস্ত এক দৈত্যের মতো চেহারা হবে রকেটটির। রকেটের পিছন দিকের ব্যাসই হবে ৬৫ ফিট। তিনটি ধাপে রকেটটিকে ভাগ করা হবে। প্রথম ধাপে থাকবে ৫১টি রকেট মোটর এবং ৫,২৫০ টন জ্বালানি। দেড় মিনিটের কম সময়ের মধ্যেই এই জ্বালানি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে রকেটটির বেগ হবে ঘণ্টায় ৫,২৫৬ মাইল এবং মাত্র কয়েক মাইল উচুঁতে উঠবে রকেটটি। প্রথম ধাপের জ্বালানি নিঃশেষিত হবার পরে রকেটের প্রথম ধাপের ৫১টি মোটর খসে পড়বে। তারপর শুরু হবে দ্বিতীয় ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে থাকবে ৩৪টি মোটর, জ্বালানি পুড়বে ৭৭০ টন, সময় লাগবে দু-মিনিটের সামান্য কিছু বেশি, রকেটের বেগ হবে ঘণ্টায় ১৪,৩৬৪ মাইল এবং দ্বিতীয় ধাপের ধাপে রকেটটি মোট ৪০ মাইলের উচ্চতায় পৌঁছবে। তৃতীয় ও শেষ ধাপে রকেটটির বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১৮,৪৬৮ মাইল এবং ৬৩ মাইল উচ্চতায় উঠে আসবে। তারপরে আর মোটর চালু রাখবার প্রয়োজন হবে না, এই প্রচণ্ড বেগ রকেটটিকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে ১০৭৫ মাইলের উচ্চতায় এবং তখন তার বেগ হবে ঘণ্টায় ১৫,০০০ মাইলের কিছু কম। আমরা জানি ১০৭৫ মাইলের উচ্চতায় চক্রবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১৫,৮৪০ মাইল। সুতরাং আরো প্রায় ১০০০ মাইলের গতিবেগ সঞ্চিত হওয়া দরকার। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে কক্ষপথে ছুটবার জন্যে তৈরি হবার পরে শেষবারের জন্যে রকেটের মোটর চালু হয়ে আরো প্রায় হাজার মাইলের গতিবেগ যুক্ত হবে। এইভাবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ও নির্দিষ্ট বেগে পৌঁছতে পারার পরে রকেটটি

হয়ে উঠবে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং উপগ্রহটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে অনন্তকাল ধরে পাক দিতে শুরু করবে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহটির জন্যে কোন্ বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করা হবে?

আমরা জানি, পৃথিবীর চরকিপাক পশ্চিম থেকে পূবে। কল্পনা করা যাক্, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ঠিক বিষুবরেখার উপরে নির্দিষ্ট একটি উচ্চতায় পশ্চিম থেকে পূবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে যে এই উপগ্রহটি থেকে ভূপৃষ্ঠকে পুরোপুরি দেখা যাবে না—যেটুকু দেখা যাবে তা হচ্ছে বিষুবরেখার বরাবর একটি ফালি। কিন্তু উপগ্রহের কক্ষপথ যদি এমন হয় যে উপগ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর দুই মেরুপ্রদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু উপগ্রহটি থেকে সম্পূর্ণ ভূপৃষ্ঠকে দেখা সম্ভব। মনে করা যাক, উপগ্রহটির কক্ষপথের উচ্চতা পৃথিবী থেকে ১০৭৫ মাইল। তাহলে উপগ্রহটির চক্রবেগ হবে ঘণ্টায় প্রায় ১৬,০০০ মাইল এবং প্রতি দু-ঘণ্টায় উপগ্রহটি পৃথিবীকে একবার পাক দেবে। ওদিকে পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় পুরো একটি চরকিপাক খাচ্ছে; সুতরাং উপগ্রহটি যে-সময়ের মধ্যে বারোটি পাক দেবে সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবী একবার সম্পূর্ণ চরকিপাক দিচ্ছে। অর্থাৎ উপগ্রহটির প্রতি পাকের সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠের বারো ভাগের একভাগ দেখা যাবে এবং উপগ্রহের বারোটি পাকে দেখা যাবে সম্পূর্ণ ভূপৃষ্ঠ!

সুতরাং উপগ্রহটির জন্যে কোন্ বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট হবে—তা নির্ভর করছে উপগ্রহটির কাজ কী হবে তার উপরে। ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উপগ্রহটি উত্তর-দক্ষিণ কক্ষপথে ১০৭৫ মাইল উচ্চতায় ঘণ্টায় প্রায় ১৬,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। যদি গ্রহান্তরগামী ব্যোমযানের জন্যে বাড়তি জ্বালানি যোগান রাখাই উদ্দেশ্য তাহলে উপগ্রহটি পশ্চিম-পূর্ব কক্ষপথে ৩০০ মাইল উচ্চতায় ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে

প্রদক্ষিণ করবে। যদি উদ্দেশ্য হয় রেডিও রীলে স্টেশন নির্মাণ করা তাহলে কক্ষপথ হবে পশ্চিম থেকে পূবে, আর কক্ষপথের উচ্চতা হবে ২২,০০০ মাইল এবং প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার উপগ্রহটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে—অর্থাৎ পৃথিবী থেকে উপগ্রহটিকে মনে হবে মহাশূন্যের স্থির একটি বিন্দু।

কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে অন্য যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে উপগ্রহটিকে রকেটের সাহায্যে যে করে হোক নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট চক্রবেগে ছুট দেওয়াতে পারলেই কাজ শেষ। তারপরে আর রকেট বা মোটরের প্রয়োজনই হবে না। নিজস্ব গতিতেই রকেটটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অনন্তকাল ধরে পাক খেয়ে চলবে। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল বেগে পাক খাচ্ছে সেজন্যে কি কোন রকেট বা মোটরের প্রয়োজন হয়? সৌরমণ্ডলের অন্যান্য প্রত্যেকটি গ্রহেরই নির্দিষ্ট চক্রবেগ আছে কিন্তু সেজন্যে কোথাও কোন রকম যান্ত্রিক উদ্বেগ নেই। টান-ছুটের নিজস্ব নিয়মেই চক্রবেগের সৃষ্টি।

অবতরণ

ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদুর তীর্থের যাত্রী
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ॥

ব্যোমযান কি-ভাবে চাঁদে বা গ্রহান্তরে অবতরণ করবে, সে প্রশ্ন তো আমাদের সামনে আছেই, কিন্তু তার আগে আলোচনা করা যাক, মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহকে কি-ভাবে আবার পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনা যেতে পারে।

উপগ্রহটিকে উপরে ওঠানো হয়েছে রকেটের সাহায্যে। ঘণ্টায় অন্তত ১৮,০০০ মাইলের একটা ছুটও আছে উপগ্রহটির। এবং এই ১৮,০০০ মাইলের ছুট যতোক্ষণ উপগ্রহটির থাকবে ততোক্ষণ উপগ্রহটির মাটিতে নেমে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং উপগ্রহটিকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনার জন্যে যে উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন, তার গোড়ার কথাটা হবে যে কোন উপায়ে উপগ্রহটির গতিকে স্তিমিত করা। যদি রকেটের সাহায্য নিয়ে এই প্রচণ্ড গতিকে স্তিমিত করতে হয় তাহলে সেটা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। রকেটের ছুট তৈরি করবার জন্যে যে পরিমাণ জ্বালানি খরচ করতে হয়েছে, রকেটের ছুটকে স্তিমিত করবার জন্যেও প্রায় সেই একই পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন। অর্থাৎ উপরে ওঠা আর নিচে নামা, দুটোই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক বৃহৎ ব্যাপার।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা অন্য একটা সহজ উপায়েরও সন্ধান দিয়েছেন। পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল উপরে উঠবার সময়ে পদে পদে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—নিচে নামবার সময়ে তাই হয়ে দাঁড়ায় মস্ত একটা সুবিধের ব্যাপার। বায়ুমণ্ডল যে গতিকে ব্যাহত করে, এই ঘটনার সুযোগ কেন নেওয়া হবে না?

অবশ্য বায়ুমণ্ডল তো উল্কার গতিকেও ব্যাহত করবার চেষ্টা করে। তার পরে উল্কার কী পরিণতি হয়, তা আমরা জানি। বায়ুমণ্ডলের উপর সহসা ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের উপগ্রহেরও যে সেই পরিণতি হবে না—সে কথা জোর করে বলা চলে না। সুতরাং প্রথমেই এই সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা প্রয়োজন।

ধরে নেওয়া যাক, কক্ষপথে ছুটন্ত অবস্থাতেই উপগ্রহটির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া গেল, অর্থাৎ উপগ্রহের যেদিকে রয়েছে রকেট-মোটর সেদিকটি চলে এল সামনের দিকে। কি-ভাবে তা করা সম্ভব সে-আলোচনায় পরে আসা যাবে।

এবার যদি অল্প একটু সময়ের জন্যে রকেট-মোটরকে আবার চালু করা যায় তাহলে ধাক্কাটা গিয়ে লাগছে গতির বিপরীত দিকে। ফলে উপগ্রহের গতি একটুখানি স্তিমিত হবে। আর আমরা জানি, কক্ষপথে পাক-খাওয়া কোন গ্রহের বা উপগ্রহের গতি যদি কোন বিন্দুতে এসে স্তিমিত হয়ে যায় তাহলে পুরনো কক্ষপথ ছেড়ে গ্রহ বা উপগ্রহটি নতুন এক কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে এবং এই নতুন কক্ষপথটির খানিকটা অংশ ভিতরের দিকে সংকুচিত হয়ে আসে।

কক্ষপথের এই আংশিক সংকোচনকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঠিক বাইরেই আমাদের উপগ্রহটি পাক খেয়ে চলেছিল। এবার উপগ্রহের গতি আংশিক স্তিমিত হয়ে যাবার ফলে তার কক্ষপথের আংশিক সংকোচন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে উপগ্রহটিকে খানিকটা নিচে নামিয়ে আনবে। এবং সেই কিছুক্ষণের জন্যে উপগ্রহটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে একটুখানি ছুঁয়েই বেরিয়ে যাবে আবার। এইটুকু করতে পারলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি।

বায়ুমণ্ডলের সেই যে একটুখানি ছোঁয়াচ—তার মাশুল দিতে দিতেই চরম অধঃপতন হবে আমাদের উপগ্রহটির। ব্যাপারটা আরেকটু বিশদভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে। কক্ষপথের সেই প্রথম সংকোচনের সময়ে বায়ুমণ্ডলের সেই যে একটুখানি ছোঁয়াচ—তা যতো ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন—উপগ্রহের গতিকে একটু না একটু স্তিমিত করবেই। আর যতো অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই সেই গতি স্তিমিত হোক না কেন, তার ফলে কক্ষপথ আরো খানিকটা সংকুচিত হয়ে আসবে। সংকোচন যতো ব্যাপক হবে, উপগ্রহটির বায়ুমণ্ডলে অবস্থান হবে ততো দীর্ঘতর, ফলে উপগ্রহটির গতি ততো ব্যাহত হবে। শেষকালে এক সময়ে উপগ্রহটি সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই পাক খেতে শুরু করবে এবং গ্লাইডার যে-ভাবে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শেষকালে মাটি স্পর্শ করে—তেমনিভাবে মাটিতে নেমে আসবে উপগ্রহটি।

চাঁদে বা গ্রহান্তরে যাত্রা শুরু করবার প্রাথমিক পর্যায়টি সম্পর্কে এবার খুব স্পষ্টভাবে একটা ছবি এঁকে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে তৈরি করতে হবে এক বা একাধিক স্পেস-স্টেশন। স্পেস-স্টেশন হচ্ছে মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ, নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট চক্রবেগে সেই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলবে। স্পেস-স্টেশন তৈরি করা হবে রকেটের সাহায্য নিয়ে এবং খুব সম্ভবতঃ দু-ধাপ রকেট ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। স্পেস-স্টেশনে থাকবে বাড়তি জ্বালানির যোগান। এজন্যে প্রয়োজন হবে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে স্পেস-স্টেশনের যোগাযোগের একটা নিয়মিত ব্যবস্থা। সমুদ্রগামী জাহাজ যেমন অনেক সময়ে মাঝ-দরিয়ায় নোঙর ফেলে থাকে এবং সেই জাহাজের সঙ্গে ডাঙ্গার যোগাযোগ রাখা হয় ফেরী-স্টিমারের সাহায্যে—তেমনি স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির যোগাযোগও রাখা হবে ফেরী-স্টিমারের ধরনের রকেটের সাহায্যে। এই বিশেষ ধরনের রকেটগুলো এক-একবার প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি সমেত স্পেস-স্টেশনে উঠে আসবে এবং মাল খালাস করে দিয়ে

আবার নেমে আসবে পৃথিবীর মাটিতে। কি-ভাবে নেমে আসবে তা আমরা আলোচনা করেছি।

এবার চাঁদে বা গ্রহান্তরে যাত্রার উপযোগী একটি ব্যোমযান পৃথিবী থেকে রওনা হতে পারে। ব্যোমযানটিকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথে, সেখান থেকে সে প্রয়োজনীয় জ্বালানির যোগান নেবে, তারপর ছুট দেবে নির্দিষ্ট গন্তব্যপথে। মনে রাখা দরকার যে রকেটটিকে যদি একছুটে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হত তবে সেই ছুটের বেগকে অর্জন করা রকেটের পক্ষে হয়ে উঠত অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু মাঝপথে এই বিরাম স্থানটি থাকার ফলে সেই দুরূহ ছুটকে দুটি সহজ ছুট-এ ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে স্পেস-স্টেশনের কক্ষপথ পৃথিবীর মাটি থেকে তিনশো মাইল উচ্চতায় এবং স্পেস-স্টেশনের চক্রবেগ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল, তাহলে অনায়াসে বলে দেওয়া যায় যে ব্যোমযানটির প্রথম পর্যায়ের ছুট এমন হবে যেন ব্যোমযানটি এই বিশেষ উচ্চতায় এই বিশেষ চক্রবেগ অর্জন করতে পারে। তারপরে জ্বালানির যোগান নেবার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যোমযানটির ছুট এমন হবে যেন আর মাত্র ৭,০০০ মাইলের একটি গতিবেগ ব্যোমযানটির পূর্বেকার গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়।

সাধারণ বুদ্ধি থেকেই এখানে একটি অনুমান করে নেওয়া চলে। গন্তব্যস্থান থেকে ফিরে আসার পরে পৃথিবীর মাটিতে না নেমে ব্যোমযানটি এই বিশেষ কক্ষপথেই থাকুক না কেন! দ্বিতীয় বারের যাত্রা তো এখান থেকেই শুরু হতে পারে! পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার দায়িত্বটুকু না হয় সেই ফেরী-স্টিমারের ধরনের বিশেষ রকেটের উপরেই থাকুক! বৈজ্ঞানিকদেরও তাই মত। এমন কি তাঁরা একথাও বলেন যে গন্তব্যস্থানে গিয়েও ব্যোমযানটির মাটিতে নামার কোন প্রয়োজন নেই। সেখানেও ব্যোমযানটি নির্দিষ্ট এক কক্ষপথে নির্দিষ্ট চক্রবেগে পাক খেতে থাকুক এবং একটি ফেরী-রকেট প্রয়োজনীয় জ্বালানির যোগান নিয়ে নেমে

যাক মাটিতে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে চাঁদে বা গ্রহান্তরে যাতায়াতের জন্যে যে সব ব্যোমযান ব্যবহৃত হবে তাদের অবস্থান হবে মহাশূন্যেই। মহাশূন্য থেকেই তারা রওনা হবে আবার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেও মহাশূন্যেই তারা থাকবে। মাটি থেকে উঠে আসা বা মাটিতে নেমে যাওয়ার জন্যে ফেরী-স্টিমারের মতো যাতায়াত করবে বিশেষ ধরনের রকেট।

এবার তাহলে বিশেষ একটা সমস্যা ওঠে। যে-সব গ্রহে পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল আছে সেখানে না হয় উপরে বর্ণিত উপায়ে অবতরণ করা গেল—কিন্তু যেখানে বায়ুমণ্ডল নেই সেখানে অবতরণ করবার উপায় কী? যেমন, চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই—সেখানে মাটিতে নামা হবে কি করে? এমন কি, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলও এত পাতলা যে সেখানেও হয়তো বায়ুমণ্ডলের সাহায্য নিয়ে অবতরণ সম্ভব হবে না। সুতরাং অন্য একটা উপায়ের সন্ধানও নিশ্চয়ই করতে হবে।

একটা দৃষ্টান্ত নিলে সুবিধে হয়। পৃথিবী থেকে একটি ব্যোমযান চাঁদে যাত্রা করেছে—দেখা যাক, ব্যোমযানটি কি-ভাবে যাত্রা করবে, কি-ভাবে পথ অতিক্রম করবে, কি-ভাবে অবতরণ করবে। এ-বিষয়ে যেন কোন রকম সন্দেহ না থাকে যে আপাতত বেশ কয়েকবার চাঁদে যাতায়াত করেই মহাশূন্যে যাতায়াতের ব্যাপারে আমাদের পোক্ত হয়ে উঠতে হবে। আমাদের কপাল ভালো যে পৃথিবীর এত কাছাকাছি চাঁদের মতো একটি উপগ্রহ থেকে গেছে। যেমন, বাড়ির সদরেই যদি পুকুর থাকে তবে সাঁতার শেখার জন্যে সমুদ্রে যাবার দরকার হয় না, সেই পুকুরেই যতো খুশি দাপাদাপি করা চলতে পারে।

অতএব আমাদের ব্যোমযান পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে চাঁদের দিকে রওনা হোক। অবশ্য রওনা হবার আগে সেই একই কক্ষে ঘূর্ণ্যমান স্পেস-স্টেশন থেকে প্রয়োজনমতো জ্বালানি সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছে। আর রওনা হবার সময়কে এমনভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে যেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ব্যোমযানটি সুনিশ্চিতভাবে চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে পারে। মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পৌঁছতে হলে

যেমন একটা পাকিপাকি হিসেব থাকা দরকার যেন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিন্দুতে নির্দিষ্ট গ্রহের সঙ্গে ব্যোমযানের সাক্ষাৎ হতে পারে— চাঁদে পৌঁছতে হলেও হিসেবটা তার চেয়ে একটুকু কম পাকাপাকি হলে চলবে না। যাত্রা করবার সময়ে ব্যোমযানটির গতিমুখ ঠিক কোন্‌দিকে নির্দিষ্ট করা হবে তাও নির্ভর করবে এই সময়ের উপরে। ব্যোমযানটি যতোক্ষণ কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে ততোক্ষণ প্রতি মুহূর্তে তার গতিমুখ পরিবর্তিত হয়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ব্যোমযানটি প্রতি নব্বুই মিনিটে একবার পশ্চিম থেকে পূবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে— তাহলে দেখা যাবে প্রতি পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর ব্যোমযানটির গতিমুখ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, অর্থাৎ এই মুহূর্তে ব্যোমযানটির গতিমুখ যদি হয় পূবদিকে তাহলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে পৃথিবীকে আধাআধি পাক খেয়ে এসে ব্যোমযানটি ছুটবে পশ্চিমদিকে। আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ব্যোমযানটির গতিমুখ পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আবার হয়ে যাবে পূবদিকে। সুতরাং ঠিক কোন্ সময়টিতে ব্যোমযানটি কক্ষ ছেড়ে সিধে ছুট দেবে—তারই উপর নির্ভর করছে ব্যোমযানটির গতিমুখ কোন্‌দিকে হবে।

আর সিধে ছুট দেবার সময়ে অন্য একটা দিকেও নজর রাখতে হবে— তা হচ্ছে ছুটের বেগ। কী বেগে ছুট দেবে ব্যোমযানটি ?

সহজ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, বেগ যতো বেশি হয় ততো ভালো। হিসেব করে দেখা গেছে যে আমাদের ব্যোমযান যদি ঘণ্টায় ২৭,০০০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে রওনা হয় তাহলে ১৯ ঘণ্টা পরে চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে। আর ব্যোমযানটি যদি রওনা হয় ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল বেগে তাহলে চাঁদে পৌঁছতে সময় লাগবে পুরো ১১৯ ঘণ্টা। বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে যাবার জন্যে শেষোক্ত বেগটিকে অনুমোদন করেন। ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল বেগের মাপটা এমনই যে আমাদের ব্যোমযান কোনক্রমে পৃথিবীর টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অবশ্য সঠিকভাবে বলতে গেলে, চাঁদ পৃথিবীর এত কাছাকাছি রয়েছে যে

ব্যোমযানটি কোন সময়েই এমন একটা দূরত্বে গিয়ে পৌঁছবে না যেখানে পৃথিবীর টানকে উপেক্ষা করা চলে। এভাবে প্রায় চারদিন ব্যোমযানটিকে চলতে হবে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে এবং টানের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে বলে একটু একটু করে ব্যোমযানটির বেগ স্তিমিত হয়ে আসবে। শেষকালে চার দিনের দিন ব্যোমযানটি এসে পৌঁছবে পৃথিবী ও চাঁদের ত্রিশঙ্কুরাজ্যে। চাঁদের থেকে ২৪,০০০ মাইল দূরে এই ত্রিশঙ্কুরাজ্যের সীমানা—এখানে পৃথিবীর টান ও চাঁদের টান কাটাকুটি হয়ে যায়। এই সীমানায় এসে যখন ব্যোমযান পৌঁছবে তখন তার বেগের সঞ্চয় প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেছে, আমাদের যাত্রার শুরুতে ব্যোমযানটি যে ২৪,৯০০ মাইল বেগে ছুট দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি বেগে নয়, তার কারণটা এবার বুঝে নেওয়া যেতে পারে। চাঁদের টানের রাজ্যে পৌঁছবার আগে ব্যোমযানটির নিজস্ব বেগ যেন যথাসম্ভব কম থাকে। কারণ এই ত্রিশঙ্কুরাজ্যের সীমানা পার হবার পরেই ব্যোমযানটির বেগ চাঁদের টানে দ্রুত বাড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত এই বেগ বাড়তে বাড়তে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়বার পূর্ব-মুহূর্তে হবে ঘণ্টায় ৫,২০০ মাইল। সহজ বুদ্ধিতেই বলা চলে, ব্যোমযানটিকে যদি নিরাপদে চাঁদের মাটিতে নামাতে হয় তাহলে এই প্রচণ্ড বেগকে স্তিমিত করা দরকার।

এবার তাহলে আমাদের গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। বায়ু-মণ্ডলের সাহায্য ছাড়া কি-ভাবে নিরাপদে অবতরণ সম্ভব ?

চন্দ্র-অভিযান

ইতিপূর্বে বায়ুমণ্ডলের সাহায্য নিয়ে নিরাপদ অবতরণের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি, রকেটের বেগকে স্তিমিত করবার জন্যে রকেটকে ঘুরিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ রকেটের সামনের দিকটা হয়ে যায় পিছনের দিক, পিছনের দিকটা হয় সামনের দিক। এটুকু যদি করা না যায় তাহলে কিছুতেই রকেটের বেগকে স্তিমিত করা সম্ভব নয়।

প্রথমে দেখা যাক, ছুটন্ত অবস্থায় রকেটকে এভাবে ডিগবাজি খাওয়ানো কি-ভাবে সম্ভব হতে পারে ?

আসলে কিন্তু মহাশূন্যের অবাধ পরিমণ্ডলে কোন ব্যোমযানের পক্ষে ডিগবাজি খাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পৃথিবীর মাটির দিকে যখন কোন বস্তু নেমে আসে তখন তা সাধারণতঃ ডিগবাজি খায় না কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলটাই সেখানে একটা বাধা। কিন্তু বায়ুমণ্ডলহীন মহাশূন্যে অবস্থাটা অন্য ধরনের। মহাশূন্যে ব্যোমযানটি গতিশীল থাকতে পারছে কারণ ব্যোমযানটির উপরে দুটি বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল—একটি টান, অপরটি ছুট। টান-ছুটের নিজস্ব নিয়মে ব্যোমযানটির অবাধ সঞ্চরণ। এবং যেহেতু কোথাও কোন রকম বাধা নেই। অতএব ব্যোমযানটি ভারশূন্য। এই অবস্থায় ব্যোমযানটির সামনের দিক বা পিছনের দিক বলে কিছু থাকে না। হয়তো দেখা যাবে, অনবরত ডিগবাজি খেতে খেতেই ব্যোমযানটি ছুটছে। সেখানে বরং এমন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ব্যোমযানটির ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ হয়—ব্যোমযানটির স্পষ্ট একটা সামনের দিক এবং স্পষ্ট একটা পিছনের দিক থাকে। আর যদি কোন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যোমযানের ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ করা যেতে পারে, তবে সেই একই যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যোমযানকে ডিগবাজি খাওয়ানো যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাটির নাম ফ্লাই-হুইল।

মনে করা যাক, ব্যোমযানটির ভারকেন্দ্রে একটি ফ্লাই-হুইল লাগানো আছে। ব্যোমযানটি ঠিক যেদিকে ডিগবাজি খাচ্ছে তারই সঙ্গে মিল রেখে যেন ফ্লাই-হুইলটি লাগানো হয়েছে। পরের পৃষ্ঠার ছবির দিকে তাকালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে, ব্যোমযানটি কোন্‌দিকে ডিগবাজি খাচ্ছে, ফ্লাই-হুইলটিকেও বসানো হয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে। এবার যদি যান্ত্রিক উপায়ে ফ্লাই-হুইলটিকে একই দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে

ব্যোমযানের ডিগবাজি খাওয়ার পাক আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। এবং ফ্লাই-হুইলটিকে যদি যথেষ্ট বেগে পাক খাওয়ানো যায় তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ব্যোমযানটির ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

আবার একই প্রক্রিয়ার সাহায্যে উল্‌টো ফলও পাওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, ব্যোমযানটি স্বাভাবিক ভাবেই ছুটছে ; অর্থাৎ কোন
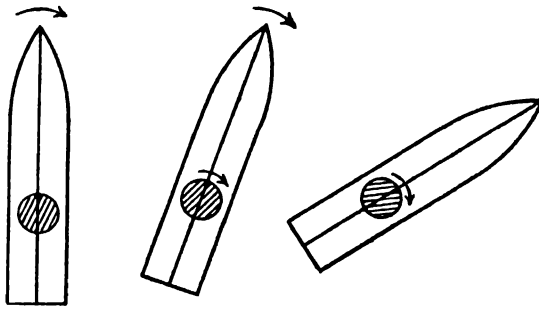
রকম ডিগবাজির পাক নেই। এবার যদি ব্যোমযানটির ভারকেন্দ্রে ফ্লাই-হুইল পাক খেতে শুরু করে, তবে দেখা যাবে, অতি ধীরে ধীরে ব্যোমযানের মধ্যেও সেই পাক-খাওয়াটা সঞ্চারিত হচ্ছে। এই পাক-খাওয়াটা যদি আধাআধি চলতে দেওয়া হয় তবে ব্যোমযানের সামনের দিকটা হয়ে যাবে পিছনের দিক, পিছনের দিকটা হবে সামনের দিক।

তারপরে ফ্লাই-হুইলের পাক-খাওয়া বন্ধ করলেই ব্যোমযানের পাক-খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

এবার আমাদের ব্যোমযানের মূল গতিকে অনুসরণ করা যাক। পৃথিবী ও চাঁদের ত্রিশঙ্কুরাজ্য পার হবার পরে আমাদের ব্যোমযানের বেগ বেড়ে চলেছে। শেষকালে চাঁদের কাছাকাছি এসে ব্যোমযানের বেগ হবে ঘণ্টায় ৫,০০০ মাইল। মনে রাখা দরকার যে ব্যোমযানের আরোহীরা এই বর্ধিত বেগকে টের পাবে না। কারণ চাঁদের টানে ব্যোমযানটি অবাধে নেমে আসছে, সুতরাং ব্যোমযানটির ভারশূন্য অবস্থা। যতোক্ষণ পর্যন্ত না ব্যোমযানটির গতি কোথাও বাধা

পাচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত আরোহীদের ভারবোধ আসবে না। তাদের মনে হবে, মহাশূন্যে তারা নিশ্চল হয়েই রয়েছে, বরং চাঁদটাই যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

যাই হোক, এবার যদি রকেটের মোটরকে আবার চালু করা যায় তাহলে রকেটের গতির বিপরীত দিকে একটা বেগ সৃষ্টি হবে। এবং যতো বেশি বেগ সৃষ্টি হবে ততোই রকেটের গতি হবে স্তিমিত। এইভাবে বিপরীত দিকে বেগ সৃষ্টি করে চার মিনিট সময়ের মধ্যে ব্যোমযানকে একেবারে নিশ্চল করে ফেলা সম্ভব। এই চার মিনিট সময়ের মধ্যে রকেটটি মাত্র ১৬০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করবে।

চাঁদ থেকে ব্যোমযানটির দূরত্ব এবং চাঁদের দিকে ব্যোমযানটির নামার বেগ রাডার যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারিত হবে। চাঁদের মাটি থেকে এমন একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে তারপরে রকেটের মোটরকে চালু করতে হবে যেন চাঁদের মাটির ফুট-কুড়ি উপরে এসে ব্যোমযানটি নিশ্চল হয়ে যায়। তারপরে রকেটের মোটর বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং কুড়ি ফুট উঁচু থেকে মাটিতে পড়তে দেওয়া হবে ব্যোমযানটিকে। ব্যোমযানের তলার দিকটা এমনভাবে তৈরি হবে যেন কুড়ি ফুট উঁচু থেকে মাটিতে পড়ার ধাক্কাটা এমন কিছু মারাত্মক না হয়ে ওঠে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরতিপথের যাত্রাও মোটামুটি একই ধরনের। ফিরতিপথে ঘণ্টায় ৫,২০০ মাইল বেগ সঞ্চয় করতে পারলেই ব্যোমযানটি সরাসরি চাঁদের টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। যদি ব্যোমযানে যথেষ্ট জ্বালানির যোগান থাকে তাহলে এবার সরাসরি যাত্রা করতে কোন বাধা নেই। তবে জ্বালানি যদি যথেষ্ট না থাকে তাহলে ব্যোমযানটি প্রথম পর্যায়ে চাঁদের কক্ষপথে উঠে আসার বেগ (ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইল) সঞ্চয় করতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে জ্বালানির যোগান নিয়ে আর একটি ব্যোমযান চাঁদের কক্ষপথে অপেক্ষা করছে। সেই অপেক্ষমান (তার মানে এই নয় যে ব্যোমযানটি মহাশূন্যের কোন এক বিন্দুতে স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে ; আসলে ব্যোমযানটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট চক্রবেগে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ

করে চলেছে) ব্যোমযান থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে নিয়ে আমাদের ব্যোমযান অনায়াসেই আরও ১৫০০ মাইলের একটা বেগ তার আগেকার বেগের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে।

আর আমাদের ব্যোমযানটির যদি এমন যথেষ্ট জ্বালানির সঞ্চয় থাকেও যে চাঁদের মাটিতে নামা এবং চাঁদের মাটি থেকে উঠে আসার জন্যে সেই সঞ্চয়ের উপরেই নির্ভর করা চলে তাহলেও কিন্তু ফিরতিপথে ব্যোমযানটির পক্ষে এক লাফে চাঁদের মাটি ছাড়িয়ে উঠে আসবার চেষ্টা না করাই ভালো। বরং যদি নামার সময় বাড়তি জ্বালানির ট্যাংক-গুলিকে চাঁদের কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া যায় এবং উঠে আসার সময়ে সেই ট্যাংকগুলোকে আবার সংগ্রহ করে নেওয়া যায়—তাহলে উভয় পথেই বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যাবার ফলে জ্বালানির খরচ অনেকটা কমে।

পৃথিবীর দিকে ফিরতিপথে চাঁদ ও পৃথিবীর ত্রিশঙ্কুরাজ্য পার হবার পরেই পৃথিবীর টানে ব্যোমযানটির গতি বাড়তে শুরু করবে। বাড়তে বাড়তে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে ব্যোমযানটির বেগ হবে ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ব্যোমযানটির সরাসরি পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার কোন প্রয়োজন নেই ; ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ব্যোমযানটি কক্ষপথে পাক খেতে থাকুক ; মাটিতে নামার জন্যে বিশেষ ধরনের ফেরী-রকেট ব্যবহার করা হবে।

সুতরাং পৃথিবীর কাছাকাছি এসে আমাদের ব্যোমযানটির বেগ কমিয়ে আনতে হবে ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল থেকে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইলে। যে প্রক্রিয়াটি এইমাত্র বর্ণনা করা হল তার সাহায্যে অনায়াসেই এটা করা সম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, বেড়াতে আসার জায়গা হিসেবে চাঁদের কোন আকর্ষণই নেই। একটা মরা জগৎ। কিন্তু চাঁদে যদি একটা পাকাপাকি রকমের ঘাঁটি তৈরি করা যায় তাহলে অনেক সুবিধে আছে। ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত করার

টার্মিনাস স্টেশন হবে চাঁদ—পৃথিবী থেকে চাঁদে যাতায়াতটা হবে লোকাল ট্রেনের যাতায়াতের মতো। আর গ্রহান্তরে যাতায়াতের ব্যাপারেই শুধু নয়, চাঁদে যদি দু-একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে মহাকাশের ঠিকানা আরো নির্ভুলভাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে। হাওয়া দিয়ে মোড়া পৃথিবীতে আমাদের দৃষ্টি পদে পদে ব্যাহত ও বিভ্রান্ত হয়, চাঁদের নিবাত আকাশ সেদিক থেকে কাচের মতো স্বচ্ছ।

তাছাড়া পৃথিবীতে যে-সমস্ত উপাদান আছে তার প্রত্যেকটি উপাদানকে চাঁদের দেশেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন ব্যবস্থাও সম্ভব হতে পারে যে ব্যোমযানের জ্বালানি চাঁদেই তৈরি করে নেওয়া যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে গ্রহান্তরে যাত্রার জন্যে চাঁদ হবে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। জ্বালানির যোগান থাকবে অথচ মাত্র ৫,২০০ মাইলের বেগ সঞ্চয় করতে পারলেই উধাও হওয়া যাবে মহাশূন্যে—গ্রহান্তরে যাত্রার পক্ষে এর চেয়ে অনুকূল অবস্থা আর কী হতে পারে!

ত্রিশঙ্কু জীবন

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র—সেথা শুভ্র ভাস,
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।

ব্যোমযান সম্পর্কে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকে অন্তত এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে মহাশূন্যে যাতায়াত করবার জন্যে তিন ধরনের ব্যোমযান দরকার।

একটি হচ্ছে ফেরী-রকেট। জমি থেকে মহাশূন্যের কক্ষপথে মালপত্র নিয়ে আসা বা মহাশূন্যের কক্ষপথ থেকে মালপত্র নিয়ে জমিতে নামা—এই হবে ফেরী-রকেটের কাজ। পৃথিবী, মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে যে ধরনের ফেরী-রকেট ব্যবহৃত হবে তা হবে ডানাযুক্ত এবং বায়ুমণ্ডলের সাহায্য নিয়ে তা অবতরণ করবে।

দ্বিতীয়টিও ফেরী-রকেট তবে ডানাহীন এবং বায়ুমণ্ডলশূন্য উপগ্রহে বা গ্রহে ব্যবহৃত হবে। এই ধরনের রকেট অবতরণ করবে, গতির বিপরীত দিকে রকেটের বেগ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়টি হচ্ছে মহাশূন্যে যাতায়াতের ব্যোমযান। এই ধরনের ব্যোমযান কখনো জমিতে নেমে আসবে না, পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট এক উচ্চতায় নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে রওনা হয়ে চন্দ্রে, মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পৌঁছবে এবং গন্তব্যস্থানেও ব্যোমযানটির অবস্থান হবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় নির্দিষ্ট এক কক্ষপথে।

এই বইয়ে একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে, মহাশূন্যে সঞ্চরণশীল অবস্থায় ব্যোমযান কি-ভাবে জ্বালানি সংগ্রহ করবে। ছবিটিতে উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যোমযানকেই দেখানো হয়েছে। সামনের

দিকে নম্বরযুক্ত যে ব্যোমযানটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে ডানাযুক্ত ফেরী-রকেট। এই ধরনের ফেরী-রকেট পৃথিবীতে, মঙ্গলগ্রহে ও শুক্রগ্রহে জমির সঙ্গে মহাশূন্যের কক্ষপথের যোগাযোগ রক্ষা করবে। ছবির নিচের দিকে যে ব্যোমযানটিকে দেখানো হয়েছে সেটি হচ্ছে ডানাহীন-ফেরী-রকেট। ছবিতে লম্বা নলের সাহায্যে পাম্প করে ডানাযুক্ত ফেরী-রকেট থেকে ডানাহীন ফেরী-রকেটে জ্বালানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ছবির পিছনদিকে অনেকটা ডাম্বেলের মতো চেহারার যে ব্যোমযানটিকে দেখা যাচ্ছে তা মহাশূন্যে যাতায়াতের জন্যে। ব্যোমযানটির একটি গোলকে আছে আবাস-কক্ষ ও জ্বালানির ট্যাংক, অপরটিতে আছে রকেট-মোটর। ছবিতে দেখা যাবে, এই ব্যোমযানটির কাছাকাছি রয়েছে আর একটি ডানাযুক্ত ফেরী-রকেট। বুঝতে হবে যে এই ব্যোমযানটিও এই বিশেষ ফেরী-রকেট থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করেছে।

কিন্তু ব্যোমযান যে ধরনেরই হোক না কেন, সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থার দিক থেকে সব ধরনের ব্যোমযানের মধ্যেই কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। যেমন, নিশ্বাস নেবার জন্যে বায়ু চাই, আবাসকক্ষে সঠিক চাপ ও উত্তাপ বজায় রাখা চাই, ইত্যাদি। তাছাড়া চাই জল ও খাদ্য। অর্থাৎ এমন একটি ব্যবস্থা করা যাতে ব্যোমযানটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ হয়ে ওঠে। যখন যা-কিছুর প্রয়োজন হতে পারে, সবকিছুরই ব্যবস্থা ব্যোমযানে থাকবে।

প্রথমে আলোচনা করা যাক, বায়ুর ব্যবস্থা করা নিয়ে। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে পনেরো পাউণ্ড। এই বায়ুর সবটাই অক্সিজেন নয়। অক্সিজেনের পরিমাণ হচ্ছে এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে তিন পাউণ্ড। সুতরাং ব্যোমযানের আবাসকক্ষে যদি তিন পাউণ্ড চাপের অক্সিজেনের যোগান রাখা যায় তাহলেই স্বাভাবিক শ্বাসপ্রক্রিয়া চলতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের পনেরো পাউণ্ড চাপ না হয়ে চাপ হচ্ছে মাত্র তিন পাউণ্ড। কিছুদিন অভ্যাসের পরে এই পঞ্চমাংশ চাপকেও

কষ্টকর মনে হবে না। তাছাড়া এতে বাড়তি একটা সুবিধা আছে, মহাশূন্যে ব্যোমযানের বাইরের দিকে কোন চাপ নেই, সুতরাং ব্যোমযানের ভিতরে যতো বেশি চাপ সৃষ্টি করা হবে ব্যোমযানের কাঠামোকে ততো বেশি মজবুত করতে হবে। যেমন, ব্যোমযানের অভ্যন্তরে যদি বায়ুমণ্ডলের সমান চাপ বজায় রাখতে হয় তাহলে ব্যোমযানের কাঠামোর উপর চাপ পড়বে প্রতি বর্গফুটে এক টন। সুতরাং সবচেয়ে কম যে-চাপে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্ভব সেই মাপটিতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত। স্পেস-সুটের বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি ; স্পেস-সুটও এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে স্পেস-সুটের অভ্যন্তরেও এই বিশেষ মাপের চাপ বজায় থাকে এবং তা সত্ত্বেও হাত-পা নাড়াচাড়া করতে কোনরকম অসুবিধে না হয়।

সারাদিনে একজন মানুষের কতখানি অক্সিজেনের প্রয়োজন হতে পারে? পৃথিবীর মাটিতে একজন মানুষ যদি দিনরাত পরিশ্রম করে তবে তার জন্যে ৩ পাউণ্ড অক্সিজেন প্রয়োজন, যদি দিন-রাত ঘুমোয় তবে ১ পাউণ্ড। মহাশূন্যে কোনকিছুর ভার নেই, সেখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে ঘুমন্ত মানুষের চেয়েও কম। হিসেব করে দেখা গেছে, ব্যোমযানে মানুষ পিছু ০·৮১৫ পাউণ্ড অক্সিজেনের যোগান থাকাটাই যথেষ্ট।

আবার মহাশূন্যে ভার না থাকার ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে অন্য একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস বেরিয়ে আসে তা যথেষ্ট উত্তপ্ত বলে হাল্‌কা— এবং তা উপরের দিকে ওঠে। অর্থাৎ আমাদের নাকের ফুটোর নিচে সব সময়েই তাজা বাতাসের যোগান থাকে। কিন্তু ব্যোমযানে হাল্‌কা-ভারী বলে কিছু নেই। উত্তপ্ত বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এসে নাকের ফুটোর নিচেই জড়ো হয়ে থাকবে এবং সেই একই বাতাস আবার প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতর ঢুকবে। সুতরাং নিশ্বাস-বায়ুকে ঠেলে সরিয়ে দেবার কোন একটা ব্যবস্থা

যদি না থাকে তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই 'দমবন্ধ' অবস্থা সৃষ্টি হবে। বাক্সের মধ্যে একটা জ্বলন্ত বাতি রেখে যদি উঁচু থেকে মাটির দিকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে আমরা জানি, বাতিটি যতোক্ষণ নিচের দিকে পড়ছে, অর্থাৎ যতোক্ষণ পৃথিবীর টানে বাতির নেমে আসা অবাধ—ততোক্ষণ বাতিটির কোন ভার নেই। সেই অবস্থায় দেখা গেছে, বাতির শিখা প্রথমে হয়ে ওঠে ঠিক একটা গোলকের মতো, তারপরেই দপ্ করে নিভে যায়। এখানেও সেই একই কারণ ; উত্তপ্ত বাতাস শিখার চারপাশে জড়ো হয়ে থেকে তাজা বাতাসের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যোমযানের ভিতরে যাতে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি না হয় সেজন্যে একটা জবরদস্তি বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ব্যোমযানের ভারশূন্যতার জন্যে অবাঞ্ছিত অবস্থা আরও অনেক কিছুই হয়। সে আলোচনায় পরে আসা যাবে।

এর পরের সমস্যা—উত্তাপ বজায় রাখা। সহজ বুদ্ধি থেকে বলা চলে, মহাশূন্যে উত্তাপের সমস্যাটা খুব বড়ো সমস্যা নয়। সূর্যের অজস্র আলো থেকে অনায়াসেই প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে। আসল সমস্যা হচ্ছে সেই উত্তাপকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রিত করা। যেমন, শুক্রগ্রহ যদি ব্যোমযানের লক্ষ্য হয়, তবে যাত্রাপথের শেষ দিকে সূর্যের তাপ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে ; মঙ্গলগ্রহ লক্ষ্য হলে তা হয়ে যাবে অর্ধেক । আবার যে-কোন সময়ে ব্যোমযানের একদিক থাকবে সূর্যের তাপে, অন্যদিক অন্ধকারে। আবার এমন অবস্থাও হতে পারে যে বেশ কিছুদিনের জন্যে কোন একটি গ্রহের ছায়া দিয়ে ব্যোমযানকে চলতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ব্যোমযানের উত্তাপের যোগান থাকা দরকার ব্যোমযানের ভিতরেই। আবার ব্যোমযানের একদিকে যদি চকচকে পালিশ থাকে আর অন্যদিকে থাকে ক্যামেরার ভিতরের অংশের মতো অনুজ্জ্বল কালো, তবে চকচকে দিকটা থেকে সমস্ত আলো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে, কালোদিক সমস্ত আলো শুষে নেবে ; অর্থাৎ চকচকে দিক সহজে উত্তপ্ত হবে না, কালোদিক

চট্ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এবার ব্যোমযানের কোন্‌দিক্‌টা সূর্যের আলোর দিকে থাকবে তারই উপর নির্ভর করবে ব্যোমযানের উত্তাপ। এবং আমরা জানি ব্যোমযানকে গতিশীল অবস্থাতেও খুশি-মতো ওলোট-পালোট খাওয়ানো যায়।

এর পরের আলোচনা—জল ও খাদ্য। হিসেব করে দেখা গেছে মানুষপিছু প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োজন হবে ৩ পাউণ্ড, জল ২·৫ পাউণ্ড। এই হিসেব থেকে বলা যায়, শুক্রগ্রহে একবার যাতায়াত করতে হলে মানুষপিছু অন্তত ৭·৫০ টন খাদ্য প্রয়োজন, মঙ্গলগ্রহে একবার যাতায়াতের জন্যে প্রয়োজন ৮·১৫ টন। আর এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যকে ঠিকমতো রাখার জন্যে যে পরিমাণ পাত্রের প্রয়োজন, তার ওজনও নিতান্ত কম হবে না।

মহাশূন্যে যাত্রা করতে হলে আরও একাধিক সমস্যা আছে।

যেমন ধরা যাক, রওনা হবার মুহূর্ত থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যোমযানের বেগ হবে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বা সেকেণ্ডে সাত মাইল। একেবারে স্থির অবস্থা থেকে এই বেগবান অবস্থায় পৌঁছতে ব্যোমযানের যে ত্বরণ (acceleration) থাকা দরকার—তা সহ্য করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? স্টেশন থেকে রওনা হবার সময়ে ট্রেন যদি আচমকা ছুট দেয় এবং প্রতি মুহূর্তে যদি সেই ছুটের বেগ বাড়তে থাকে—তাহলে যাত্রীদের মনে হবে, কে যেন সব সময়ে তাদের ট্রেনের গতির বিপরীত দিকে ঠেসে ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে ট্রেনের বেগ একটা মাপে এসে স্থির হয়ে থাকে, সেই মুহূর্ত থেকে এই ঠেসে ধরার অনুভূতিটুকু আর থাকে না। এমন কি জানলার বাইরে গাছপালা-মাঠের দিকে না তাকালে অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না যে ট্রেন ছুটছে। ব্যোমযানের ছুট দেওয়াটা আরো বেশি আচমকা আর তার বেগ বেড়ে চলে আরো লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে। আমরা জানি, পৃথিবীর টান বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই মানুষের শরীরে ভার আসে। পৃথিবীর টানটা হচ্ছে আসলে এমনি এক ত্বরণযুক্ত বেগ। তার একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। এই নির্দিষ্ট

মাপের ত্বরণযুক্ত বেগ যখন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সৃষ্টি করে এক নির্দিষ্ট মাপের ভার। আবার কোন কারণে যদি এই ত্বরণযুক্ত বেগের মাপ দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে সৃষ্টি হবে দ্বিগুণ মাপের ভার। সুতরাং ব্যোমযান যখন ছুট দেয় এবং এই ছুটের বেগ প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে অর্থাৎ ব্যোমযানের বেগ হয় ত্বরণযুক্ত, তখন যাত্রীদের মনে হবে যেন তার শরীরের ভার বেড়ে গেছে। কতটা বেড়েছে সে নির্ভর করবে ত্বরণের মাপের উপরে। এখানে খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে ছুট মাত্রেই অস্বস্তিকর নয়। ঠিক এই মুহূর্তে যখন আমরা ভাবছি যে পৃথিবীর মাটিতে আমরা স্থির হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছি তখনো আমাদের পৃথিবী ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল বেগে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে, আর পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি আমরা। এই প্রচণ্ড গতি সত্ত্বেও আমরা কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করি না—এমন কি এই প্রচণ্ড গতিকে টের পাই না পর্যন্ত। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ছুট যদি সমান বেগে হয় তাহলে সেটা অস্বস্তিকর নয়, অস্বস্তিকর হয় অসমান বেগের বেলায় বা ত্বরণযুক্ত বেগের বেলায়। অতএব চেষ্টা হবে যতো বেশি সময় নিয়ে সম্ভব ব্যোমযানের চূড়ান্ত বেগ আয়ত্ত করা, অর্থাৎ ব্যোমযানের ত্বরণকে সাধ্যমতো কম মাপে রাখা। প্রশ্ন উঠতে পারে, বেশ তো, ধীরেসুস্থেই আগাগোড়া পথটা যাওয়া যাক না কেন। বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আসল কথাটা হচ্ছে, ব্যোমযানকে নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়ানো। এই বেগ সঞ্চয় করতে হবে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে ; আবার জ্বালানির পরিমাণ খুশিমতো বাড়ানো চলে না, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষিত হয়ে যায়—এই সমস্ত কারণে ব্যোমযানটির নিষ্ক্রমণ-বেগ আয়ত্ত করতে হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। তবুও, একটু ধীরেসুস্থেই যাতে ব্যোমযানটি নিষ্ক্রমণ-বেগে পৌঁছতে পারে তার উপায় বৈজ্ঞানিকরা স্থির করেছেন।

এ-আলোচনাও পূর্বেই হয়েছে। তবুও আরেকবার সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

নিচের ছবিটির দিকে তাকালে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ভূপৃষ্ঠের **ক** বিন্দু থেকে ব্যোমযানটি রওনা হচ্ছে। **ক** থেকে **খ** বিন্দু পর্যন্ত ব্যোমযানটিকে ছুট দিতে হচ্ছে পৃথিবীর টানের সরাসরি বিপরীত দিকে। **খ** বিন্দুতে এসে ব্যোমযানটি পূবদিকে বাঁক নিচ্ছে এবং **গ** বিন্দু পর্যন্ত মোটামুটি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল রেখায় ছুট দিচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে **ক** থেকে **খ** বিন্দুতে পৌঁছবার জন্যে ব্যোমযানটিকে অত্যন্ত দ্রুত বেগসঞ্চয় করতে হবে—কারণ পৃথিবীর টান চাইবে প্রতি মুহূর্তে ব্যোমযানটিকে শ্লথগতি করে তুলতে। কিন্তু **খ** থেকে **গ** বিন্দুতে যাবার সময়ে যদিও পৃথিবীর টান ব্যোমযানটিকে নিচের দিকে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করবে—এবং কিছুটা নামিয়ে আনবেও—কিন্তু ব্যোমযানটির গতি শ্লথ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং **খগ** দূরত্ব অতিক্রমণের সময়ে ব্যোমযানটি
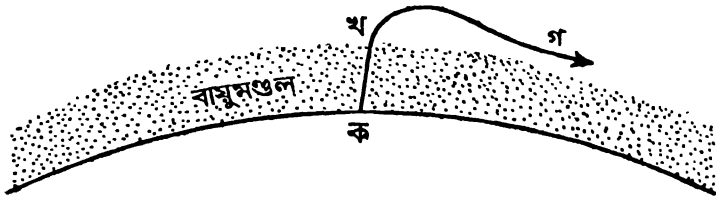
অপেক্ষাকৃত ধীরে বেগসঞ্চয় করতে পারে—এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের বিরুদ্ধে নয় বলে বেগসঞ্চয়টা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে বেগসঞ্চয় করতে করতে চক্রবেগে পৌঁছতে পারলেই ব্যোমযানটি আর নিচে নেমে আসে না—সেই বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে শুরু করে। তারপর কক্ষপথে অবস্থানকালেই জ্বালানি সংগ্রহ করে নিয়ে ছুট দিতে পারে মহাশূন্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, **খ** বিন্দুতে পৌঁছবার পরে বেগসঞ্চয় করাটা এমন রয়েসয়ে হয় যে ব্যাপারটা কিছুমাত্র অস্বস্তিকর হতে পারে না। **ক** থেকে **খ** বিন্দু পৌঁছতেই যা কিছু অস্বস্তি। কিন্তু এই অস্বস্তি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে এবং নানাভাবে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ব্যোমযানের বেগসঞ্চয় বা ত্বরণ যদি এমন মাপের

হয় যে শরীরের ওজন চারগুণ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেইটুকু অস্বস্তি মানুষ 'বসা' অবস্থাতেই সহ্য করতে পারে ; আর 'শোয়া' অবস্থায় এই সহ্যশক্তি বেড়ে যায় আরো বহুগুণ। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যে পাড়ি দেবার পথে প্রথম কয়েক মিনিটের ত্বরণজনিত অস্বস্তি মানুষের সহ্যশক্তির সীমার মধ্যেই থাকে।

কিন্তু ব্যোমযানের যাত্রীদের কাছে শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়াটাই একমাত্র অস্বস্তি নয়। শরীরের ওজন একেবারে না থাকার অস্বস্তিও তাদের ভোগ করতে হয়। শরীরের ওজন বাড়ে তো মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে কিন্তু ব্যোমযানের যাত্রীদের অধিকাংশ সময়ে শরীরের কোন ওজনই থাকে না। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কি মানুষের পক্ষে দীর্ঘকাল কাটানো সম্ভব ?

কোন্ অবস্থায় এসে ব্যোমযানের যাত্রীদের শরীরের কোন ওজন থাকে না, সে-কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার কল্পনা করা যাক, সেই ওজনহীন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় এসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন কেমন হবে।

মহাশূন্যের এই ত্রিশঙ্কু-জীবন মানুষের শরীরে ও মনে কী কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা আগে থেকেই বাস্তব পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা চলে, শারীরিক অসুবিধা বিশেষ কিছু হবে না। কারণ দেখা গেছে, মাথা নিচের দিকে ও পা উপরের দিকে রেখেও মানুষের পক্ষে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা সম্ভব। অসুস্থ রোগী মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে থাকে ; সে-অবস্থায় তার শরীরের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম চলে একটা সমান্তরাল রেখায়, পৃথিবীর টানের সঙ্গে কোথাও বিরোধিতা থাকে না। কিন্তু তবুও অন্তত এই কারণে রোগীকে বিশেষ কোন অস্বস্তি ভোগ করতে হয় না।

বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে ভারশূন্যতার জন্যে শারীরিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে বেশি। ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভারশূন্যতার জন্যে তাদের শারীরিক কোন উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আশা করা যায়,

মানুষের ক্ষেত্রেও হবে না। কিন্তু আজন্ম অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অবস্থায় বাস করতে গিয়ে কিছুটা মানসিক প্রতিক্রিয়া হওয়া বিচিত্র নয়। যেখানে উপর-নিচ বলে কিছু নেই, ভারী-হাল্‌কা বলে কিছু নেই, শোয়া-দাঁড়ানো বলে কিছু নেই—এমনি এক একাকার পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা খুব সহজ কথা নয়। আবার পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ারও একটা বিপদ আছে। তাহলে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসার পরে পদে পদে এত বেশি ঠোক্কর খেতে হবে যে নিজেকে মনে হবে শিশুর মতো অসহায়।

অবশ্য ব্যোমযানে কৃত্রিম উপায়ে ভারসৃষ্টি করা চলে। ইতিপূর্বে স্পেস-স্টেশনের আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি, স্পেস-স্টেশনে কি-ভাবে কৃত্রিম ভার সৃষ্টি করা যেতে পারে। ব্যোমযানের ক্ষেত্রেও সেই একই উপায়। অর্থাৎ ব্যোমযানটিকে চরকিপাক খাইয়ে দিতে হবে। তবে কৃত্রিম ভারসৃষ্টি করতে হলে কিছুটা গঠনগত অসুবিধেও আছে। ব্যোমযানের চরকিপাকের ব্যাসার্ধ যদি খুব বড়ো না হয় তাহলে কামরার মেঝের উপর দাঁড়িয়ে মনে হবে, সামনের দিকের মেঝে উঁচুদিকে উঠে যাচ্ছে। আবার দুজন মানুষ যদি সামনা-সামনি দাঁড়ায় তবে দুজনেই দুজনের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তাছাড়া মাথার উপরে যদি কোন আড়াল না থাকে, ব্যোমযানের সম্পূর্ণ গোলকটিই যদি একটিমাত্র কামরা হয়, তাহলে একদিকে দাঁড়িয়ে অন্যদিকের মেঝের উপরে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখে মনে হবে যেন সে ছাদ থেকে ঝুলে আছে। এই অবাঞ্ছিত দৃষ্টিবিভ্রমকে এড়াবার জন্যে মাথার উপরে সিলিং তোলা দরকার। এবং ব্যোমযানটিকে যদি খুব বড়ো ব্যাসার্ধে পাক খাওয়াতে হয় তাহলে গঠনগত জটিলতাও আসে। আর ব্যোমযানকে এভাবে পাক খাওয়ানোর সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হচ্ছে পর্যবেক্ষণের অসুবিধে। ব্যোমযানের পাক-খাওয়াটা ব্যোমযানের যাত্রীরা নিজেরা টের পাবে না বটে কিন্তু বাইরের দিকে তাকালে তাদের মনে হবে যেন বাইরের আকাশটা পাক খাচ্ছে। সেই অবস্থায় সুস্থিরভাবে কোন কিছুকে পর্যবেক্ষণ করা বা যন্ত্রের

সাহায্যে কোন রকম মাপ নেবার চেষ্টা করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ভারশূন্য অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করাটা যখন নিতান্তই একটা অভ্যাসের ব্যাপার সেক্ষেত্রে কৃত্রিম ভারসৃষ্টি করাটা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন।

তবে অন্য একটা খুব সহজ উপায়ে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করা যায় যে মনে হবে মাটির তলায় শক্ত মাটি আছে। উপায়টি হচ্ছে চুম্বকযুক্ত জুতো ব্যবহার করা। তার ফলে মেঝের সঙ্গে পায়ের একটা শক্ত বন্ধন থাকবে এবং অসাবধানে হাত-পা নাড়ার জন্যে আচম্‌কা ফস্‌ করে এদিক-ওদিক চলতে শুরু করার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যের যাত্রীদের পক্ষে ভারশূন্য অবস্থাটাও খুব একটা বড়ো সমস্যা নয়।

এ তো গেল ব্যোমযানের যাত্রীদের নানা অসুবিধে ও সমস্যার কথা। এবার প্রশ্ন ওঠে, মহাশূন্যে ব্যোমযানটি ঠিক পথে চলছে কিনা, তা তা জানবার উপায় কী?

মহাশূন্যে অজস্র তারা আছে। এই সব তারার অবস্থান দেখে ব্যোমযানের অবস্থান নির্ধারিত করা চলে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে তারাগুলো রয়েছে অনেক অনেক দূরে। সুতরাং তারার অবস্থান দেখে ব্যোমযানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভবপর নাও হতে পারে। এ-ব্যাপারে সূর্য এবং অন্য তুটি গ্রহকে নিরিখ করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলা দরকার ব্যোমযানের চালকের কাছে এমন একটি চার্ট থাকবে যে চার্টের দিকে তাকিয়েই যে কোন সময়ে নক্ষত্র, সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের সঠিক অবস্থান জেনে নেওয়া যেতে পারে। হিসেবের সুবিধের জন্যে ধরে নেওয়া যাক, বিভিন্ন গ্রহ ও ব্যোমযানটি একই সমতলে আছে। এবার ব্যোমযানটির সঠিক অবস্থান নির্ধারিত করতে হলে যে-কোন তুই গ্রহ ও সূর্যের অবস্থান প্রথমে জেনে নিতে হবে। গ্রহতুটি যদি হয় পৃথিবী ও শুক্র তাহলে ব্যোমযানটির

অবস্থান নির্ণয় করবার উপায় হচ্ছে এই : সূর্য থেকে পৃথিবীর ও সূর্য থেকে শুক্রগ্রহের কৌণিক দূরত্ব যন্ত্রের সাহায্যে জেনে নিতে হবে ; আর সেই বিশেষ মুহূর্তে সূর্য থেকে পৃথিবীর এবং সূর্য থেকে শুক্র-গ্রহের সত্যিকারের দূরত্ব চার্ট থেকেই জেনে নেওয়া যাবে ; এর পর ব্যোমযানের সঠিক অবস্থান করে নেওয়া একটা সহজ জ্যামিতিক হিসেবের ব্যাপার। মহাশূন্যে ব্যোমযানটির অবস্থানকালে অন্তত তিনটি গ্রহকে যে-কোন সময়ে দেখা যাবেই। সুতরাং ব্যোমযানটির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে যে-কোন সময়ে এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা চলে।

কিন্তু ব্যোমযানটির অবস্থান নির্ণয় করা যতো সহজ, বেগ নির্ণয় করা ততো সহজ নয়। একটি উপায় হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যোমযানটির অবস্থান জেনে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট সময়ে ব্যোমযানটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা হিসেব করে নেওয়া। সময় এবং দূরত্ব জানা গেলেই বেগের মাপ অনায়াসে বার করে নেওয়া চলে। কিন্তু এই উপায়টির একটি অসুবিধে হচ্ছে এই যে নির্দিষ্ট সময় পার না হলে কিছুতেই বেগ জানা যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা না করে যদি সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমযানটির বেগ জেনে নিতে হয় তাহলে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। মনে করা যাক, মর্সের টরেটক্কায় সিগ্‌নাল পাঠাবার মতো বেতার-তরঙ্গে সেকেণ্ডে হাজারটা করে টরেটক্কা পৃথিবী থেকে পাঠানো হচ্ছে। ব্যোমযানটির গতি যদি পৃথিবীর দিকে হয় তাহলে দেখা যাবে ব্যোমযানের গ্রাহকযন্ত্রে সেকেণ্ডে হাজারটারও বেশি টরেটক্কা ধরা পড়ছে। ব্যোমযানটি যদি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে কিন্তু এক হাজারেরও কম টরেটক্কা ধরা পড়বে। কতগুলি বেশি বা কতগুলি কম টরেটক্কা ধরা পড়ছে তা থেকেই ব্যোমযানের বেগ বার করে নেওয়া যায়।

ইতিপূর্বে ব্যোমযানের অবস্থান নির্ণয় করবার সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বিভিন্ন গ্রহ ও ব্যোমযান একই সমতলে আছে। আসলে কিন্তু তা নেই। যেমন, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ ১·৯

ডিগ্রি কোনাকুনি রয়েছে, পৃথিবী ও শুক্রগ্রহের কক্ষপথ রয়েছে ৩'৪ ডিগ্রি কোনাকুনি। কোনাকুনির এই মাপ দুটিকে তুচ্ছ মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। তাচ্ছিল্য করবার ফল এমনও হতে পারে যে যাত্রাপথের শেষে দেখা গেল ব্যোমযান এসে হাজির হয়েছে গ্রহের ৫০,০০,০০০ মাইল 'উপরে' বা 'নিচে'। সুতরাং সময় থাকতেই ব্যোমযানটিকে সঠিক দিকে চালিত করতে হবে।

এবার ব্যোমযানের সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে বেতার ও রাডার যন্ত্র। মহাশূন্যে যাত্রা করতে হলে যেমন প্রয়োজন রকেট-মোটরের তেমনি প্রয়োজন বেতার ও রাডারের।

ইতিপূর্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তরের কথা উল্লেখ করেছি। তখন বলা হয়েছে যে এই আয়নিত স্তর থেকে ছোট-ঢেউয়ের বেতারবার্তা ঠিকরে ফিরে আসে। এ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তর যে ছোট-ঢেউয়ের বেতারবার্তাকে ফিরিয়ে দেয় তার মাপ হচ্ছে ১০ মিটারের কাছাকাছি। তার চেয়েও ছোট মাপের ঢেউ হতে পারে এবং সেই ঢেউ অনায়াসেই বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তরকে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং মহাশূন্য থেকেও বেতারের সাহায্যে অনায়াসে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে।

এবং বাস্তবেও তা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে পৃথিবী থেকে পাঠানো বেতারবার্তা ২½ সেকেণ্ড পরে চাঁদের গা থেকে ঠিকরে ফিরে আসে। চাঁদের দেশের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তর যে-যে মাপের ঢেউয়ের কাছে বাধাস্বরূপ নয় তার বিস্তারটা অনেকখানিই। সূর্যের আলোর যে অংশকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় তাও অনায়াসেই এই আয়নিত স্তরকে পেরিয়ে আসে। কিন্তু তার চেয়ে ছোট মাপের দিকে এলে বাধা সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ বেগুনী-পারের আলো বা রঞ্জন-

রশ্মি ইত্যাদি ঢেউগুলি আয়নিত স্তর পার হয়ে আসতে পারে না। বেগুনী-পারের আলোর খুব বড়ো মাপের দু-একটা ঢেউ বড়ো জোর পৃথিবীর মাটিতে পেঁছিতে পারে, বাদবাকি সবটুকুকেই ফিরে যেতে হয়। পৃথিবীর মাটির উপরে এমনি ধরনের চাঁদোয়া আছে বলেই পৃথিবীর জীবন নিরাপদ হতে পেরেছে।

যাই হোক, যে যে মাপের ঢেউ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নিত স্তরকে পেরিয়ে যেতে পারে তার বিস্তার আমাদের কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্টই বলতে হবে। উপযুক্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে পারলে চন্দ্রের সঙ্গে এবং অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে বেতার ও রাডার বার্তার যোগাযোগ স্থাপন করা কিছুমাত্র শক্ত কাজ হবে না। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে আলোড়নের ফলে যে বেতার-ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তার কিছু অংশ পৃথিবীর যন্ত্রেও সাড়া জাগাতে পারে। সুতরাং এক গ্রহের সঙ্গে অন্য গ্রহের বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করাটা নতুন কিছু ব্যাপার হবে না।

কিন্তু অন্য একটা অসুবিধে আছে। বেতার ঢেউয়ের বেগ আলোর মতোই, সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সুতরাং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পাঠানো বেতার-ঢেউ পৃথিবীর অন্য প্রান্তের যন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগায়। কিন্তু পৃথিবীর বাইরের জগতের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করবার সময়ে দেখা যাবে, বেতার-ঢেউয়ের যাতায়াতের জন্যে কিছুটা সময় লাগছে। চাঁদে যাতায়াত করবার জন্যে বেতার-ঢেউয়ের সময় লাগে ২½ সেকেণ্ড ; শুক্রগ্রহ ও মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি তখনো এই দুটি গ্রহে একবার যাতায়াত করতে বেতার-ঢেউয়ের সময় লাগে যথাক্রমে পাঁচ মিনিট ও নয় মিনিট। আলোর চেয়েও দ্রুততর বেগে যাতায়াত করতে পারে এমন কোন কিছুর সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে পাওয়া সম্ভবও নয়— সুতরাং এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে কথাবার্তা বলবার সময়ে এই অসুবিধেটুকু মেনে নিতেই হবে।

সরঞ্জামের পরে সাজের কথায় আসা যাক। ইতিপূর্বে একবার কল্পনার রকেট চেপে আমরা মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছিলাম। তখন বলা হয়েছিল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে নানা ধরনের মৃত্যুদূত সর্বদা হানা দিয়ে ফিরছে এবং তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। যেমন, বেগুনী-পারের আলো, মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কাপাত ইত্যাদি।

বেগুনী-পারের আলোকে অবশ্য অতি সহজেই ঠেকানো যায়। এক ধরনের কাচ আছে যার ভিতর দিয়ে বেগুনী-পারের আলো কিছুতেই যাতায়াত করতে পারে না। ব্যোমযানকে অনায়াসেই এই কাচ দিয়ে মুড়ে দেওয়া চলে।

কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মি এত সহজ ব্যাপার নয়। যদি আড়াল তুলে এই রশ্মিকে ঠেকাতে হয় তবে অন্তত এক গজ চওড়া সীসের দেওয়াল তুলতে হবে। সুতরাং সে চেষ্টা না করে বরং দেখা যাক, মহাজাগতিক রশ্মি সত্যই মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা।

মহাজাগতিক রশ্মি কিন্তু পৃথিবীর মাটিতেও এসে পৌঁচচ্ছে। তবে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছবার জন্যে তাকে আগাগোড়া বায়ুমণ্ডলে গুঁতো খেয়ে খেয়ে আসতে হয়, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যেতে পারে যে বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে এই রশ্মির অন্য ধরনের চেহারা।

বৈজ্ঞানিকরা মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। এখন পর্যন্ত যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি যে মহাজাগতিক রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে মহাজাগতিক রশ্মিকে ভয়ংকর একটা কিছু .বলে কল্পনা করাটা ঠিক হবে না।

বাকি থাকে উল্কাপাতের কথা। উল্কাপাত যে কী ভয়ংকর হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি। এখন যদি বলি, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উল্কাপাতের সংখ্যা ৭৫০,০০০,০০০, ০০০.০০০.০০০- -তাহলে হয়তো চমকে উঠতে হবে। অবশ্য

অধিকাংশ উল্কাই একদানা বালির চেয়েও ছোট, লাখ পঞ্চাশেক মসুর ডালের একটা দানার মতো—মাত্র পাঁচ-দশটার আকার এমন হতে পারে যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগেই তারা পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছে যায়। উল্কার তুলনায় পৃথিবীটা এত বড়ো যে উল্কাপাতের ফলে পৃথিবী টলে উঠবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বালির দানার চেয়েও ছোট একটা উল্কা অনায়াসেই ব্যোমযানের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, উল্কাপাতের বেগ ঘণ্টায় ১,৬০,০০০ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে। এই প্রচণ্ড বেগের জন্যেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কাও ব্যোমযানকে ফুটো করে দিতে পারে।

তবে একটা বাঁচোয়া আছে। মহাশূন্যে ব্যাপ্তি এমন কল্পনাতীত রকমের বিরাট যে ব্যোমযানের সঙ্গে উল্কার ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হবে। হিসেব করে দেখা গেছে, পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে হাজার দশেক বার যাতায়াত করলে একবার হয়তো একটা উল্কাপাতের ঠেলা খেতে হবে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে মহাশূন্যে যাতায়াতের পথে উল্কাপাতটা এমন কিছু মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক ব্যাপার নয়। উল্কাপাত বড় জোর ব্যোমযানে একটা ফুটো করে দিতে পারে, একাধিক উল্কাপাতে ব্যোমযানের খানিকটা অংশ বড়ো জোর চালুনির মতো ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারে—কিন্তু এমন উল্কার সন্ধান লক্ষ বছরেও একবার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যে-উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যোমযান ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। সুতরাং ব্যোমযানের মধ্যে যদি এমন ব্যবস্থা থাকে যে ফুটো হলে তা সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে নিতে পারা যায়—তাহলে উল্কাপাতকে ভয় করে চলবার কোন কারণ নেই। আর আগেই বলেছি, ব্যোমযানের ভিতরে অক্‌সিজেন দিয়ে তৈরি যে বাতাস থাকবে তার চাপ হবে প্রতি বর্গফুটে মাত্র তিন পাউণ্ড—সুতরাং ব্যোমযানে ফুটো হাওয়া মাত্র ফস্ করে সমস্তটা বাতাস শূন্যে উধাও হয়ে যাবে সে-সম্ভাবনা নেই, তার আগেই ফুটো বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

মহাকাশের ঠিকানা

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে
ভ্রমি বিস্ময়ে।

দশ কোটি বিশ্ব নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব। একশো কোটি আলো-বছর ব্যাসের একটি গোলকের মধ্যে প্রায় সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই দশকোটি বিশ্ব বা দশ কোটি ছায়াপথ। বাইরে থেকে এক-একটি ছায়াপথের চেহারা কেমন দেখাবে তার একটা ছবি এই বইয়ে দেওয়া হল। আমাদের নিজস্ব বিশ্বকেও বাইরে থেকে দেখলে ঠিক এই রকমটিই দেখাবে। এমনি ঘূর্ণ্যমান চাকার মতো। প্রায় দশ হাজার কোটি তারা আছে এই চাকায় এবং চাকাটির ব্যাস এক লক্ষ আলো-বছর। চাকার কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে আছে আমাদের এই সূর্য এবং প্রায় সাড়ে-বাইশ কোটি বছরে চাকার কেন্দ্রের চারপাশে সূর্য এক-একবার পাক খাচ্ছে।.

আবার সূর্য হচ্ছে নেহাতই মাঝারি গোছের একটি তারা। আকারের দিক থেকেও এবং দীপ্তির দিক থেকেও। মহাকাশের অধিকাংশ তারাই সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়ো এবং হাজার হাজার গুণ দীপ্তিশীল। কোটি কোটি বছর ধরে প্রত্যেকটি তারা অকৃপণ ভাবে আলো ও উত্তাপ বিকীরণ করছে।

স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, সূর্য ও কোটি নক্ষত্রের তেজের সঞ্চয় কি অপরিশেষ? কোটি কোটি বছর ধরে এত অজস্র আলো ও উত্তাপ ছড়িয়ে দেবার পরেও আমাদের এই সূর্য প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায় কী করে?

সূর্য ও নক্ষত্রকে যদি কল্পনা করা হয় মস্ত এক-একটা পাওয়ার স্টেশন হিসেবে—তবে সেই পাওয়ার স্টেশনের তেজের যোগান আসে পরমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে তা আমরা জেনেছি। কল্পনা করতে হবে, সূর্য ও নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্তে যেন কোটি কোটি পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। এই পরমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে একদিকে যেমন তেজের উদ্ভব হয়, তেমনি একটা বড়ো রকমের পরিবর্তনও ঘটে। হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণু রূপান্তরিত হয় ভারী হিলিয়াম পরমাণুতে। এইভাবে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে তৈরি হয় একটি হিলিয়াম পরমাণু। কিন্তু দেখা গেছে, চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর পুরোপুরি ওজনটুকু একটি হিলিয়াম পরমাণুর মধ্যে থাকে না। ৪ পাউণ্ড হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া যায় ৩ পাউণ্ড ১৫½ আউন্স হিলিয়াম। বাকি ½ আউন্স কোথায় যায়? বাকি ½ আউন্স রূপান্তরিত হয় তেজে। তেমনি হিলিয়াম পরমাণু থেকেও এই একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে পারে আরো ভারী পরমাণু। প্রক্রিয়াটি এইভাবে চলতে থাকে এবং একে একে ভারী উপাদানগুলি তৈরি হয়ে চলে। সুতরাং অনুমান করা চলে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শুধু মৌলিক হাইড্রোজেন উপাদান ; সেই উপাদানেরই পুঞ্জীভূত রূপ হচ্ছে নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের তেজ-বিকীরণের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আরো ভারী উপাদানগুলি তৈরি হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপত্তি হয় রেডিয়াম থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম উপাদানের ভারী পরমাণুর। সুতরাং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে ৯২টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরে আর কিছু নেই, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। পৃথিবীতে না হোক, অন্যত্র আরো একাধিক মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব সম্ভব। এমন কি এই পৃথিবীতেও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে নতুন মৌলিক উপাদানের উদ্ভব হয়েছে এমন কথা কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন।

তেজ-বিকীরণের এই তত্ত্বটি যদি নির্ভুল হয় তবে এ থেকে একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত টানা চলে। তা হচ্ছে নক্ষত্রের বয়স সম্পর্কে।

বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন যে বর্তমানে আমাদের সূর্যের মোট ওজনের এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে হাইড্রোজেন; বাকি দুই তৃতীয়াংশ অন্যান্য ভারী উপাদান। আমরা ধরে নিয়েছি গোড়ার দিকে গোটা সূর্যই তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে—এ থেকে সূর্যের বয়স হিসেব করে নেওয়া চলে। এবং এই একই উপায়ে অন্যান্য নক্ষত্রের বয়সও। এই হিসেবে দেখা যায়, সূর্য এবং নক্ষত্রের বয়স ১,০০০ কোটি বছরের কাছাকাছি। আমরা জানি, আমাদের পৃথিবীর বয়স হচ্ছে ৩০০ কোটি বছর। সুতরাং এই মহাবিশ্বে আমাদের এই পৃথিবী যে একেবারেই নবীন—একথা বলা চলে না।
ইতিপূর্বে বিশ্বের যে ছবি আমরা এঁকেছি তাতে দেখা গেছে, সেখানে যেমন আছে অজস্র নক্ষত্র তেমনি আছে নীহারিকা। নীহারিকার মূল উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন। মহাশূন্যে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে এক-একটি নীহারিকার অবস্থান। বৈজ্ঞানিকদের মতে নীহারিকা থেকেই নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং নীহারিকার সমস্ত বস্তুপুঞ্জ একদা নক্ষত্রের রূপ ধারণ করবে। বর্তমানে আমাদের বিশ্বে সমস্ত নক্ষত্রের বস্তুর পরিমাণ সমস্ত নীহারিকার বস্তুর পরিমাণের সমান। অর্থাৎ, নক্ষত্র-ভবনের প্রক্রিয়াটা আধাআধি এগিয়েছে বলা চলে।
অনুমান করা চলে, আমাদের বিশ্বের বাইরে আরো প্রায় দশ কোটি বিশ্বও বিবর্তনের এই একই পর্যায়ে আছে।
তাহলে এবার যদি কল্পনা করা যায় যে কোন একটা উপায়ে আমরা সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে চলেছি—তাহলে কতদূর পর্যন্ত আমরা যেতে পারব? সময়ের কি শুরু বলে কিছু নেই? মহাকালের প্রবাহ সামনের দিকে যেমন অনন্ত, পিছন দিকেও কি তাই? পিছিয়ে যেতে যেতে এমন একটা সময়ে হয়তো পৌঁছনো যায় যখন আর সময় বলে কিছু নেই—শুধু রয়েছে একটি অখণ্ড মহা-পরমাণু। সেই মহা-পরমাণুর কি কোন গতি ছিল? যদি না থেকে থাকে তবে বলতে হয় যে সেই মহা-পরমাণুর গতিশীলতার অপেক্ষায় মহাকালও স্তব্ধ। আমাদের সময়ের মাপটা তো আসলে গতিরই মাপ। অবশ্য

মহাবিশ্বের ও মহাকালের শুরুর রূপটি ঠিক এই রকমটিই ছিল কিনা তা অবশ্য জোর করে বলা চলে না। তবে পরিণতি দেখে যদি প্রক্রিয়াকে অনুমান করে নেওয়া যায়, তাহলে প্রক্রিয়াকে দেখে তার উৎসকেও অনুমান করে নিতে বাধা নেই। সুতরাং বলা চলে, সৃষ্টির সেই মহা-আদিতে ছিল একটি অখণ্ড মহা-পরমাণু। তারপর এক সময়ে সেই মহা-পরমাণুর মধ্যে ঘটে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। ফলে সেই মহা-পরমাণুটি কোটি কোটি টুকরোয় ভাগ হয়ে গিয়ে চারদিকে ছিটকিয়ে যেতে শুরু করে। এই এক-একটি টুকরো হচ্ছে এক-একটি বিশ্ব। যে-সব টুকরোর ছিটকে যাওয়ার বেগ ছিল সবচেয়ে বেশি তারা সবচেয়ে দূরে সরে গেছে ; আর এইজন্যেই যে বিশ্ব যতো দূরে তার ছোটার বেগও ততো বেশি। তারপরে প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন টুকরোর মধ্যে বা প্রত্যেকটি পৃথক বিশ্বে নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং নক্ষত্রীভবনের প্রক্রিয়া চলছে। অনুমান করা চলে, নক্ষত্রী-ভবনের গোড়ার দিকে বিভিন্ন নক্ষত্রআরো গা ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় ছিল। একপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে যেমন দেখা যায়, একজন আরেকজনের বাড়ির আঙিনা দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করে, এমন কি কোন কোন সময়ে ঘরের ভিতরেও উঠে আসে—তেমনি সেই নক্ষত্রদলের মধ্যেও দেখা যায়, একটি নক্ষত্র অপর একটি নক্ষত্রের বড়ো কাছাকাছি চলে এসেছে, বা গায়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমরা দেখেছি যখনই এই রকম ঘটে তখনই শুরু হয়ে যায় বিপুল এক আলোড়ন, ব্যাপক এক ভাঙাভাঙি। ফলে হয়তো একটি নক্ষত্র দুটি হয়ে গিয়ে পরস্পরের টানাটানির বৃত্তরেখায় যুগল-নৃত্য শুরু করে, হয়তো বা গ্রহ-উপগ্রহ দিয়ে গাঁথা এক অপরূপ মালা নক্ষত্রটিকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি বিশ্ব বিচিত্র পরিবর্তনের সুস্পষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে।

আগেই বলেছি, এই প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায় এখনো পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। যেটুকু সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে

তা হচ্ছে এই যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও কোন গোঁজামিল নেই। সুস্পষ্ট কার্য-কারণ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই প্রত্যেকটি ঘটনার উৎপত্তি। তর্ক উঠতে পারে, এক সময়ে একটি অখণ্ড মহা-পরমাণু ছিল কি ছিল না, সেই অখণ্ড মহা-পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল কি ঘটেনি, বা এই গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি এক নক্ষত্রের সান্নিধ্যে অন্য নক্ষত্রের আবির্ভাবের জন্যেই কিনা—হয়তো প্রমাণিত হবে যে এইসব অনুমান মিথ্যা—কিন্তু তার ফলে আজকের দিনের মহাবিশ্বের ছবিটি মিথ্যা হয়ে যাবে না। এটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ঘটনা। এবং এই মহাবিশ্বে কোন ঘটনাই আকস্মিক বা অলৌকিক নয়। বড়ো জোর প্রমাণ করা চলে, ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধের কাঠামোকে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়—কাঠামোটি হয়তো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কিন্তু কার্য-কারণ সম্বন্ধ একটা কিছু থাকবেই।

অর্থাৎ, এ কথাটি আমাদের খুব স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে এই মহাবিশ্বে খামখেয়ালিপনার স্থান নেই। আমাদের এই সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি কোনক্রমেই একটি দুর্ঘটনা বা ব্যতিক্রম নয়। মহাবিশ্বের বিবর্তনের নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট একটি ঘটনাচক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে অন্য যে-কোন নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহ-উপগ্রহের একটি মণ্ডলী সৃষ্টি হতে পারে। এবং হয়েছেও। এখনো পর্যন্ত আমাদের হাতে এমন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নেই যা দিয়ে এইসব গ্রহ-উপগ্রহকে চোখ দিয়ে দেখা চলতে পারে, যদিও আশা করা যায় মহাশূন্যে যাতায়াত শুরু হবার পরে একদিন না একদিন সমগ্র মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে চোখের দেখার সীমানায় নিয়ে আসা যাবে—কিন্তু অন্তত একটি ক্ষেত্রে অঙ্ক কষে এমনি এক গ্রহের নির্ভুল সংবাদ পাওয়া গেছে।

পৃথিবী থেকে ১১ আলো-বছর দূরে ৬১-সিগ্‌নি নামে একটি যুগল নক্ষত্র আছে। একশো বছর ধরে এই যুগল নক্ষত্রটির চালচলন

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। যুগল নক্ষত্রটির চালচলন একটু যেন বেসামাল। বৈজ্ঞানিকরা অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছেন, এই যুগল নক্ষত্রটির সঙ্গে নিশ্চয়ই একটি পরিচর বস্তুপিণ্ড আছে। এই বস্তুপিণ্ডটির ভর বৃহস্পতি-গ্রহের পনেরো গুণ বা পৃথিবীর পাঁচ হাজার গুণ বেশি। এত ক্ষুদ্রকায় বস্তুপিণ্ড কিছুতেই সূর্য হতে পারে না, অতএব এটি একটি মহাকায় গ্রহ।

মনে হতে পারে, এই উপায়ে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সংবাদও জেনে নেওয়া সম্ভব। এখানে খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, পৃথিবীর মতো আকারের কোন গ্রহের টানে কোন নক্ষত্র যতোটুকু বেচাল হয় তা এত অকিঞ্চিৎকর যে তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত টানা চলে না। কিন্তু পৃথিবী থেকে ১১ আলো-বছর দূরত্বের মধ্যে যখন একটি গ্রহের অস্তিত্বের সংবাদ জানা গেছে—তা থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা চলে যে এই বিশ্বের অন্যত্রও বিপুলসংখ্যক গ্রহ-উপগ্রহ আছে। এবং যেখানেই গ্রহ-উপগ্রহ আছে সেখানেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জীবনের আবির্ভাবও সম্ভব। সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারা যায় যে আমাদের এই বিশ্বে এবং আমাদের এই বিশ্বের বাইরের বিশ্বেও যেখানেই গ্রহপরিচরওলা নক্ষত্র আছে সেখানেই হয়তো জীবনও আছে। সেই জীবনের বিশেষ রূপ কী, আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের মতোই কিনা—সে সম্পর্কে আমরা অবশ্য কিছুই জানি না এবং কিছু অনুমান করতে যাওয়াও শূন্য-কল্পনা হবে। তবে, এই মহাবিশ্বের কোথাও হয়তো মানুষের চেয়েও প্রাচীন এবং মানুষের চেয়েও উচ্চতর পর্যায়ের জীব আছে—এমন কথা শুনলে আঁতকে উঠবার কোন কারণ নেই।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বলে এসেছি, আমাদের এই মহাবিশ্ব ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ এককালে যা হয়তো ছিল একটা আমলকির মতো, তা-ই বড়ো হতে হতে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে একটা পিঙপঙের বল বা টেনিসের বল বা ফুটবলের মতো। এবং তার চেয়েও বড়ো হয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব অসীম ও

অনন্ত। কোথাও এর শেষ নেই। আবার এমনও হতে পারে, গতিশীল আলোর যে বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যে বাইরের এক-একটি বিশ্বকে এমনি ধাবমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তা ঠিক নয়; হয়তো অতি-দূরত্বকে অতিক্রম করতে গিয়ে অন্য কোন কারণে এই বিশেষ আলো এই বৈশিষ্ট্যটুকু অর্জন করেছে। তাহলে অবশ্য মহাবিশ্বের ছবিটি পাল্‌টে যায় এবং নতুন অর্জিত উপাদানের সাহায্যে নতুনভাবে এঁকে নিতে হয় সেই ছবিকে। অর্থাৎ মানুষের কোন জানাটাই শেষ জানা নয়। আবার মানুষের জানারও শেষ নেই। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায়, মহাবিশ্বের রহস্যকে মানুষ একদিন দিনের আলোর মত স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে।

কোন্ পথে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে? মানুষের পক্ষে কি সশরীরে নক্ষত্রলোকে যাত্রা করা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবেও সরাসরি বলা চলে না—না! কারণ আগামী যুগ কোন্ কল্পনাতীত সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলবে তা এত আগে থেকে কে বলতে পারে!

অবশ্য এখন ভাবলে নক্ষত্রলোকে যাত্রা করার চিন্তাটাকেই উদ্ভট বলে মনে হবে। যেমন ধরা যাক, সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র 'আল্‌ফা সেণ্টরি'; আমাদের সন্ধানে সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্যোমযান এখনো পর্যন্ত যা আছে তার সাহায্য নিয়েও এই নক্ষত্রে একবার যাতায়াত করবার জন্যে অন্তত ৭০,০০০ বছর সময়ের প্রয়োজন।

সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করা চলে, একজন মানুষের জীবনকালে যদি এই ভ্রমণকার্য শেষ করতে হয় তাহলে ব্যোমযানের বেগ এমন হওয়া প্রয়োজন যা আলোর বেগের সমান না হোক, খুবই কাছাকাছি হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও কোন মানুষের পক্ষেই আমাদের নিজস্ব বিশ্বের শেষ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা জানি, আমাদের এই বিশ্বের ব্যাস হচ্ছে এক লক্ষ আলো-বছর। অর্থাৎ আলোর সমান বেগসম্পন্ন কোন ব্যোমযানে যদি রওনা হওয়া যায় তাহলে আমাদের নিজস্ব বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে

সময় লাগবে এক লক্ষ বছর। আর মহাবিশ্বের প্রান্তে পৌঁছতে হলে একশো-কোটি বছর সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হয়।

কিন্তু তবুও নক্ষত্রলোকে যাত্রা করাটা যে একেবারেই অসম্ভব একথা কোন বৈজ্ঞানিকই জোর করে বলেন না। আলোর সমান বেগে বা একেবারে সমান না হোক খুবই কাছাকাছি বেগে, ছুট দিতে পারে এমন ব্যোমযান আবিষ্কৃত হবার পথে অন্তত কাগজে-কলমে এখন আর কোন বাধা নেই। আর সময়? সময়ের হিসেবটা আমাদের পৃথিবীতে যা আছে, পৃথিবীর বাইরেও তা থাকবে সে কথাই বা কে জোর করে বলতে পারে! সময়টা আসলে গতিবেগেরই একটা মাপ। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন যে বস্তুর বেগ বাড়ার সঙ্গে তার ভর বাড়ে এবং সময়ের প্রবাহ তার কাছে স্তিমিত হয়ে আসে। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। কল্পনা করতে হবে যে একটি ব্যোমযান এই মহাবিশ্বের গোলকটিকে একপাক ঘুরে আসবার জন্যে রওনা হয়েছে এবং ব্যোমযানটির বেগ হচ্ছে আলোর বেগের ৯৯·৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৯,৯৯৬ ভাগ। যদি মহাবিশ্বের গোলকটিকে একপাক ঘুরে আসতে ১,০০০ কোটি আলো-বছর দূরত্ব অতিক্রম করে আসতে হয় তাহলে পৃথিবী থেকে মনে হবে ব্যোমযানটি ১০,০০০,০০০,০০০ বছর পরে ফিরে এসেছে কিন্তু ব্যোমযানের যাত্রীদের মনে হবে ব্যোমযানের ফিরে আসা মাত্র ৩৩ বছর পরে!

যাই হোক, আপাতত নক্ষত্রলোকে বা মহাবিশ্বে যাত্রা করার কথা আমরা ভাবছি না। আমাদের এই সৌরমণ্ডলকেই প্রথমে ভালোভাবে চিনতে হবে। সেটাই হবে মহাবিশ্ব-অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ। এবং তখন থেকেই শুরু হবে নতুন এক যুগ। এবং এই নতুন যুগের বোধন হয়েছে যেদিন পরমাণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পেরেছে মানুষ। এই মহাবিশ্বের সমস্ত আলো ও তেজের মূলে যে মহাশক্তি ক্রিয়াশীল তাই আজ মানুষের হাতের মুঠোয়, সুতরাং অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়, মানুষের সামনে রয়েছে এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা মানুষ তবুও জানার চেষ্টা করছে। চিরকালের একটা অসন্তোষ নিয়ে যেন মানুষের যাত্রা, কখনো কোথাও এসে সে বলবে না—এই আমার জানার শেষ! রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলা চলে ঃ

"নক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোন লোকে আর কোন চিত্তকে অধিকার করে আর কোন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।"

গ্রহমণ্ডল

গ্রহ	ব্যাস (মাইলে)	ঘনত্ব (জলের ঘনত্ব একক ধরে)	সূর্য থেকে মোটামুটি দূরত্ব (মাইলে)	চক্রবেগ (মাইলে)		কক্ষ পরিক্রমা (বছরে)
				ঘণ্টায়	সেকেণ্ডে	
বুধ	৩,০০৮	৩'৭৩	৩,৬০,০০,০০০	১,০৮,০০০	২৯'৭	০'২৪১
শুক্র	৭,৫৭৬	৫'২১	৬,৭৩,০০,০০০	৭৮,১২০	২১'৭	০'৬১৫
পৃথিবী	৭,৯২৬	৫'৫২	৯,৩০,০০,০০০	৬৬,৬০০	১৮'৫	১'০০০
মঙ্গল	৪,২১৬	৩'৯৪	১৪,১৭,০০,০০০	৫৪,০০০	১৫'০	১'৮৮১
গ্রহাণুপুঞ্জ	—	—	—	—	—	১'৭৬-১৩'৭
বৃহস্পতি	৮৮,৭০০	১'৩৪	৪৮,৩৯,০০,০০০	২৯,১৬০	৮'১	১১'৮৬২
শনি	৭৫,০৬০	০'৭১	৮৮,৭১,০০,০০০	২১,৬০০	৬'০	২৯'৪৫৮
ইউরেনাস	৩০,৮৮০	১'২৭	১৭৮,৩০,০০,০০০	১৫,১২০	৪'২	৮৪'০১৫
নেপচুন	৩২,৮৪০	১'৫৮	২৭৯,৭০,০০,০০০	১২,২৪০	৩'৪	১৬৪'৭৮৮
প্লুটো	?	?	৩৬৭,০০,০০,০০০	১০,৪৪০	২'৯	২৪৭'৬৯৭

গ্রহমণ্ডল

গ্রহ	পৃথিবীর তুলনায়					নিক্রমণ-বেগ (মাইল/সেকেণ্ড)
	ব্যাস	আয়তন	ভর	ভার	সূর্য থেকে দূরত্ব	
বুধ	০·৩৯	০·০৬	০·০৩৭	০·০৪	০·৩৯	২·৪
শুক্র	০·৯৭	০·৯২	০·৮২৬	০·৮১,	০·৭২	৬·৫
পৃথিবী	১·০০	১·০০	১·০০০	১·০০	১·০০	৬·৯৫
মঙ্গল	০·৫৩	০·১৫	০·১০৮	০·১১	১·৫২	৩২
গ্রহাণুপুঞ্জ	—	—	—	—	১·৪৬-৫·৭১	—
বৃহস্পতি	১০·৯৫	১৩১২	৩১৮·৪০০	৩১৭	৫·২০	৩৮·০
শনি	৯·০২	৭৩৪	৯৫·২০০	৯৫	৯·৫৪	২৩·০
ইউরেনাস	৪·০০	৬৪	১৪·৬০০	১৪·৭	১৯·১৯	১৪·০
নেপচুন	৩·৯২	৬০	১৭·৩০০	১৭·২	৩০·০৭	১৫·০
প্লুটো	?	?	?	?	৩৯·৮	২২(?)

উপগ্রহমণ্ডল

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে মোটামুটি দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
বুধ	০			
শুক্র	০			
পৃথিবী	১	চন্দ্র	২,৩৮,৮৪০	২৭.৩২
মঙ্গল	২	ফোবোস	৫,৮২৮	০.৩২
		দেইমোস	১৫,০০০	১.২৬
বৃহস্পতি	১২	আইয়ো	২,৬১,০০০	১.৭৭
		ইওরোপা	৪,১৫,০০০	৩.৫৫
		গানিমেদে	৬,৬৪,০০০	৭.১৫
		কল্লিস্তো	১১,৬৭,০০০	১৬.৬৯
		অনামা	১,১২,৫০০	০.৫০
		”	৭১,১০,০০০	২৫০.৬২
		”	১,৪৯,৪০,০০০	৭৩৮.৯০
		”	১,৪৯,৪০,০০০	৭৪৫.০০
		”	৭১,৮৫,০০০	২৫৪.২০
		”	১,৪০,২৪,৮০০	৬৯২.৫০
		”	?	?

উপগ্রহমণ্ডল

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	উপগ্রহ	গ্রহ থেকে মোটামুটি দূরত্ব (মাইলে)	কক্ষ পরিক্রমা (দিনে)
শনি	৯	মিমাস	১,১৭,০০০	০·৯৪
		এনসেলাদাস	১,৫৭,০০০	১·৩৭
		তেথিস	১,৮৬,০০০	১·৮৯
		দিওন	২,৩৪,০০০	২·৭৪
		রিয়া	৩,৩২,০০০	৪·৫২
		টাইটান	৭,৭১,০০০	১৫·৯৫
		হাইপেরিয়ন	৯,৩৪,০০০	২১·২৮
		আয়াপেটাস	২২,২৫,০০০	৭৯ ৩৩
		ফোয়েব	৮০,৫৪,০০০	৫৫০·৪৫
ইউরেনাস	৫	আরিয়েল	১,২০,০০০	২·৫২
		আম্ব্রিয়েল	১,৬৭,০০০	৪·১৪
		টাইটানিয়া	২,৭৩,০০০	৮·৭১
		ওবেরোন	৩,৬৫,০০০	১৩·৪৬
		মিরাণ্ডা	?	১·৪০
নেপচুন	২	ট্রাইটন	২,২১,৫০০	৫·৮৮
		নেরেইড	?	?